সর্ব্বকার্য্য ত্যাগ রূপ সন্ন্যাস ধর্ম্মেই অধিকারিণী। এই বিশ্বাস, এই ভ্রান্তিই সীতারামের পতনের কারণ হইয়াছিল এবং শ্রীকেও পতনোন্মুখ করিয়া তুলিয়াছিল। সেই কথাই এই অধ্যায়ের একমাত্র বর্ণিতব্য বিষয়।

প্রথমে গীতার শ্লোকগুলি পাঠকবর্গকে স্মরণ করাইয়া দিব। (সীতারাম ২।৩ পৃষ্ঠা দেখ) ভগবান্ এই শ্লোকগুলিতে যাহা বলিয়াছেন, শ্রীর তাহা বুঝিতে ভুল হইয়াছিল। অথবা শ্রী তাহা বুঝিতে পারিয়াও তাহার অনুষ্ঠানে বিমুখ ছিল। আসক্তিশূন্য হইয়া যে বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান, তাহাই সাধারণের প্রকৃষ্ট পন্থা। মানুষ একেবারে কর্ম্মত্যাগী হইয়া থাকিতে পারে না—তাহাকে অন্ততঃ শরীরযাত্রানির্ব্বাহার্থও কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে হয়। বাহিরের কর্ম্মত্যাগ—কর্ম্মত্যাগ নহে। মনেরও কর্ম্মভাবনা ত্যাগ চাই। সে অতি কঠিন ব্যাপার—তাই ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন "তুমি কর্ম্ম কর, কিন্তু ভগবানের প্রীতি উদ্দেশে কর্ম্ম কর। শাস্ত্রে যে সকল কর্ম্ম বিহিত আছে, তাহার অনুষ্ঠানই ভগবানের প্রীতিজনক কার্য্য। এইরূপ কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারাই তুমি সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে।" বাহিরে অলস হইয়া কর্ম্মত্যাগী হইলেই তাহাকে সন্ন্যাসী বলা যায় না।

জয়ন্তীও শ্রীকে ইহাই শিক্ষা দিয়াছিলেন—তাহার এক প্রমাণ আমরা পূর্ব্বে উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছি। জয়ন্তী তথায় শ্রীকে সীতারামের নিকটে যাইয়া তাঁহাকে রাজর্ষি করিতে উপদেশ দিয়াছেন। আর দুই স্থল নিম্নে দেখাইলাম।

"জয়ন্তী বলিল, তবে তোমার অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম করিতেছ না কেন?

শ্রী। সেটা ত বুঝিতে পারিতেছি না।

জয়ন্তী। রাজধানীতে যাও। রাজপুরী মধ্যে মহিষী হইয়া বাস কর। সেখানে রাজার প্রধান মন্ত্রী হইয়া তাঁহাকে স্বধর্ম্মে রাখ। এ তোমারই কাজ।"

অন্যত্র—

"শ্রী। তবে, এখন কি কর্ত্তব্য?

জ। তুমি করিবে কি? তুমি ত বলিয়াছ যে তুমি সন্ন্যাসিনী, তোমার কর্ম্ম নাই?

শ্রী। যেমন শিখাইয়াছ।

জ। আমি কি তাই শিখাইয়াছিলাম? আমি কি শিখাই নাই যে, অনুষ্ঠেয় যে কর্ম্ম, অনাসক্ত হইয়া ফলত্যাগপূর্ব্বক তাহার নিয়ত অনুষ্ঠান করিলেই কর্ম্মত্যাগ হইল, নচেৎ হইল না? স্বামিসেবা কি তোমার অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম নহে?"

কিন্তু শ্রী ত ইহা বুঝিতে পারে নাই। তাই সে সীতারামের সহিত ঐরূপ ব্যবহার করিয়া তাহার পতনের কারণ হইল।

শ্রী কেন এই ভুল বুঝিয়াছিল, তাহার একটা উত্তর আছে। সেই উত্তরও গ্রন্থের একটা তত্ত্ব; শ্রী তাহা এইরূপে বলিয়াছে—

"বুঝি সে একদিন ছিল। যে দিন আঁচল দুলাইয়া মুসলমান সেনা ধ্বংস করিয়াছিলাম—সে দিন থাকিলে বুঝি হইত কিন্তু অদৃষ্ট সে পথে গেল না, সে শিক্ষা হইল না। অদৃষ্ট যেন ঠিক উল্টা পথে—বনবাসে—সন্ন্যাসে গেল। কে জানে আবার অদৃষ্ট ফিরিবে?

এই গ্রন্থমধ্যে যাহা দুর্ব্বোধ্য তাহাই

অদৃষ্টতত্ত্ব দ্বারা ব্যাখ্যা করিতে হইবে। সকল কার্য্যের কারণ পরম্পরা বুঝা মনুষ্যের সাধ্যাতীত। স্বয়ং জয়ন্তীও বলিয়াছেন "আগে শ্রীকে চাই। শ্রী পলাইয়া ভাল করে নাই। অথবা না পলাইলেও কি হইত বলা যায় না। আমার কি সাধ্য যে ভগবন্নির্দ্দিষ্ট কার্য্যকারণ-পরম্পরা বুঝিয়া উঠি।"

এই অদৃষ্টতত্ত্ব বা জ্যোতিষের সেই শ্রীর প্রিয়প্রাণহন্ত্রী হইবার কথা হইতেই এই উপন্যাসের আরম্ভ—ইহাতেই এই উপন্যাসের শেষ। সে কথা পারি ত অন্যত্র বিস্তৃত ভাবে বলিব।

শ্রী মনে করিয়াছিল, সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসে তাঁহার অধিকার জন্মিয়াছে। এই বুদ্ধিই তাঁহার ভ্রান্তিজনক। তাহার কারণ নিম্নে বলিতেছি।

প্রথমে দেখ—শ্রী হিন্দুরমণী। হিন্দুরমণীকে হিন্দুশাস্ত্রানুযায়ী কার্য্য করিতে হইবে। হিন্দুশাস্ত্রে পতিযুক্তার সন্ন্যাস নাই, কিন্তু সন্ন্যাস একটা উচ্চ ধর্ম্ম মনে করিয়া, শ্রী এ শাস্ত্র-শাসন লঙ্ঘন করিতে সাহস করিয়াছিল। এ কথা অবশ্য বলা যাইতে পারে যে, শ্রীর এই সাহস কিছু মন্দ কার্য্যের জন্য নহে। তবু ভগবান্ বলিয়া গিয়াছেন—

"যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামচারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্॥
তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম্ম কর্ত্তুমিহার্হসি॥"

১৬ অধ্যায়—২৩। ২৪ শ্লোক।

অর্থাৎ কার্য্য ভালই হউক আর মন্দই হউক, শাস্ত্রবিধি-অনুসারে তাহার অনুষ্ঠান করিতে হইবে। অফলীর পক্ষে সংসার-ত্যাগ ও সন্ন্যাস যেমন শাস্ত্রবিহিত, শ্রীর পক্ষে সন্ন্যাস তেমন বিহিত ছিল না। শ্রী সেই অবিহিত ধর্ম্ম পালন করিতে গিয়া গোলে পড়িয়া ছিল।*

শ্রীর পক্ষে সন্ন্যাস শাস্ত্রবিহিত নহে কেন? এরূপ প্রশ্ন উঠিতে পারে। শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন—যাহার মাতা, ভার্য্যা, অপোগণ্ড শিশু প্রভৃতি বর্ত্তমান থাকে, তাহার সন্ন্যাস অর্থাৎ সংসারত্যাগ নাই। যে রমণীর স্বামী বর্ত্তমান, তাহারও সন্ন্যাস নাই। তবে প্রশ্ন হইতে পারে, চৈতন্যের সন্ন্যাস, বুদ্ধের সন্ন্যাস, কি শাস্ত্রবিরুদ্ধ সন্ন্যাস ছিল? তাহা নহে। ইহাদিগের সন্ন্যাস শাস্ত্রবিহিত সন্ন্যাসই ছিল—কারণ ইহাদিগের বাহিরে যাহাই থাকুক, ভিতরে ইহাদিগের মাতা, পিতা, স্ত্রী, পুত্র এরূপ কেহই ছিল না। যাহার অন্তঃকরণ সম্বন্ধশূন্য, তাঁহার পক্ষে সন্ন্যাস অবিহিত হইবে কেন? শ্রীর কিন্তু সেরূপ পতিসম্বন্ধ-শূন্য অন্তর ছিল না, বুঝি পতিযুক্তা কোন রমণীরই কখনও তাহা থাকিতে পারে না; তাই শ্রীর পক্ষে সংসার ত্যাগ অবিহিত ছিল।

এই উত্তরে যাহারা সন্তুষ্ট হইবেন না, তাহারা অন্যবিধ উত্তর দেখুন। ভগবান্ বলিয়াছেন, কর্ম্মত্যাগরূপ সন্ন্যাসে সিদ্ধিপ্রাপ্তি কষ্টকর—কারণ শরীরের ও মনের উভয়বিধ কার্য্যই কেহ সহজে ত্যাগ করিতে পারে না। শ্রীও কর্ম্মত্যাগ করিতে পারে নাই বলাই বাহুল্য। শ্রীর বাহিরের কর্ম্ম ছিল, মনের কর্ম্মও ছিল।

---

* যাহারা গীতাশাস্ত্রে শ্রদ্ধাবান্ নহেন, তাঁহারা সীতারাম প্রভৃতি উপন্যাসপাঠে কিছুমাত্র সুফললাভ করিতে পারিবেন না।

সুতরাং তাঁহার পক্ষে কর্ম্মত্যাগরূপ সন্ন্যাস হইতেই পারে না। তবে কার্য্য ত্যাগ না করিয়াও এক প্রকার কর্ম্মত্যাগ বা সন্ন্যাসের ফল পাওয়া যায়। ভগবান বলিয়াছেন, ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য লাভালাভ বিবেচনা এবং সুখদুঃখজ্ঞান পরিত্যাগ করিয়া, কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিলেও সন্ন্যাসের ফল পাওয়া যাইতে পারে। শ্রী তাহাও পারেন নাই। সীতারামের মহিষী হইয়া তাঁহার রাজকার্য্যের সহায়তা করাই শ্রীর অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম ছিল। কিন্তু শ্রী সে কার্য্যের অনুষ্ঠানে বিমুখ ছিলেন—সুতরাং শ্রীর এই সংস্কারীয় সন্ন্যাসও অপ্রাপিত রহিল।

তবেই দেখিতে পাইলাম, শ্রী সংসার-ধর্ম্ম পালনের জন্য সংসার ত্যাগই মাত্র করিতে পারিয়াছিলেন; তাহাও সম্যক প্রকার নহে। কর্ম্মত্যাগ করিতে গিয়া, অকর্ত্তব্য কর্ম্মই আশ্রয় করিতেছিলেন, সকল প্রকার কর্ম্ম নহে। এই বুদ্ধি, এই ভুল, এই শিক্ষা, এই অদৃষ্ট জন্যই শ্রীকে ধর্ম্মভ্রষ্ট হইতে হইল।

এই ভ্রান্তিবশতঃ সীতারামের যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা আমরা দেখাইয়াছি। শ্রীর কি হইতেছিল, তাহা দেখাইতেছি। নিম্নোক্ত জয়ন্তী ও শ্রীর কথোপকথন পাঠকবর্গ একবার পড়িয়া দেখুন,—

"জয়ন্তী এখন উপায়—

শ্রী। পলায়ন ভিন্ন ত আর উপায় দেখি না। কেবল রাজার জন্য বা রাজ্যের জন্য বলি না। আমার আপনার জন্যও বলিতেছি। রাজাকে রাত্রি দিন দেখিতে দেখিতে মনে হয়, আমি গৃহিণী, তাঁহার ধর্ম্মপত্নী।

জয়ন্তী। তাত বটেই।

শ্রী। তাতে পুরাণ কথা মনে আসে। আবার কি ভালবাসার ফাঁদে পড়িব? তাই আগেই বলিয়াছিলাম রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ না করাই ভাল। শত্রু, রাজা লইয়া যায় জন।

জয়ন্তী। আর এখানে কে আপনার শত্রু? ভাবি ত সন্ন্যাস রাখিয়াছ, দেখিতেছি যাহা জগদীশ্বরে সমর্পণ করিয়াছিলে, তাহা আবার কাড়িয়া লইতেছ দেখিতেছি। একে কি বলে সন্ন্যাস?"

দেখ গ্রন্থকার কত সূক্ষ্ম ধর্ম্ম তোমাদিগকে দেখাইতেছেন। শ্রী স্বামীর প্রতি একটু আসক্ত, স্বামীর নিকটে আসিয়া একটু ইন্দ্রিয়বশ হইয়াছিল বলিয়া আপনাকে পাপী মনে করিতেছে—পতনোন্মুখ মনে করিতেছে। ফলতঃ গীতোক্ত ধর্ম্ম এইরূপই সূক্ষ্ম ধর্ম্ম বটে।

কথাটা কিন্তু সত্য। সকল অবস্থাতেই ইন্দ্রিয়-বশ্যতা পাপজনক। সীতারামের শ্রী-আসক্তিও পাপপূর্ণ—শ্রীরও পূর্ব্বোক্ত অবস্থা পাপজনক! এ কথা হিন্দু ভিন্ন আর কোন জাতি বলে নাই—বলিতে পারে না—এ কথা হিন্দু-কাব্য ভিন্ন অন্য কোন জাতির কাব্যে প্রকাশিত হয় নাই, হইতেও পারে না।

শ্রীর দোষের ভাগটা ত দেখাইলাম। এরূপ দোষ দেখিয়া অনেক পাঠকই চমকিয়া উঠিবেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু এ সম্বন্ধে শ্রী যাহা বলিয়াছে—সেই

একবার স্মরণ করিয়া, এ সম্বন্ধে আমাদিগের বক্তব্য শেষ করিব।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি ধর্ম্মপথে ভ্রান্তি এবং ধর্ম্মশিখরে উঠিতে পতনও বড় শ্লাঘা নহে।

শ্রীর যাহা ভুল ছিল, তাহা বলিয়াছি। এখন সেই ভুল সত্ত্বেও শ্রীর যে পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল, শ্রী যাহা হইয়াছিল, তাহাই বলিব।

শ্রী ছিল কি? পতিপ্রাণা এক গৃহস্থ রমণী। হউক না কেন তাহার পতিপ্রেম সাগরের তুল্য, তবু তাহাকে সামান্যা মানবী ভিন্ন আর কি বলিতে পারা যায়। কিন্তু জয়ন্তীর শিষ্যা সেই শ্রী কি আর সে মানবী ছিল?

জয়ন্তীর শিক্ষায় শ্রীর শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ সৌন্দর্য্যই লক্ষগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। যখন শ্রী জয়ন্তীর নিকট হইতে প্রেরিত হইয়া সীতারামের নিকটে উপস্থিত হইলেন, "তখন সীতারাম ঊর্দ্ধমুখে স্পন্দিততার লোচনে, অতৃপ্ত দৃষ্টিতে শ্রীর পানে চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন। কোন কথা নাই—যেন বা নয়নের তৃপ্তি না হইলে কথার স্ফূর্ত্তি সম্ভাবিত হইতেছে না। দেখিতে দেখিতে, দেখিতে দেখিতে—যেন তাঁহার আনন্দপ্রফুল্ল মুখমণ্ডল আর তত প্রফুল্ল রহিল না—একটা নিশ্বাস পড়িল। রাজা, আমার শ্রী বলিয়া ডাকিয়াছিলেন, বুঝি দেখিলেন আমার শ্রী নহে। বুঝি দেখিলেন, যে স্থিরমূর্ত্তি, অবিচলিতকর্ম্মসম্পন্না অক্ষবিন্দুরাজশূন্যা, উদ্ভাসিতকররশ্মিমণ্ডলমধ্যবর্ত্তিনী মহামহিমাময়ী এ যে দেবী প্রতিমা। বুঝি এ শ্রী নহে।"

[illegible] দেখ—

"আলাপটা কি রকম হইল মনে করুক। রাজা বলিতেন, ভালবাসার কথা, শ্রীর জন্য তিনি এতদিন যে দুঃখ পাইয়াছিলেন তাহার কথা, শ্রীভিন্ন জীবনে তাঁহার আর কিছু নাই, সেই কথা। কত দেশে কত লোক পাঠাইয়াছেন, কত দেশে নিজে কত খুঁজিয়াছেন, সেই কথা। শ্রী বলিত, কত পর্ব্বতের কথা, কত অরণ্যের কথা, কত বন্য পশু পক্ষী ফল মূলের কথা, কত যতি পরমহংস ব্রহ্মচারীর কথা, কত ধর্ম্ম অধর্ম্ম, কর্ম্ম অকর্ম্মের কথা, কত পৌরাণিক উপন্যাসের কথা, কত দেশবিদেশী রাজার কথা, কত দেশাচার লোকাচারের কথা।

"শুনিতে শুনিতে, সেই পৃথক আসনে বসিয়াও রাজার বড় বিপদ হইল। কথাগুলি বড় মনোমোহিনী। যে বলে সে আরও মনোমোহিনী। আগুন ত জ্বলিয়াই ছিল, এবার ঘর পুড়িল। শ্রী ত চিরকালই মনোমোহিনী। যে শ্রী বৃক্ষবিটপে দাঁড়াইয়া আঁচল হেলাইয়া রণজয় করিয়াছিল, রূপে এ শ্রী তাহার অপেক্ষা অনেক গুণে রূপসী। শরীরের স্বাস্থ্য এবং মনের বিশুদ্ধি হইতেই রূপের বৃদ্ধি জন্মে;—শ্রীর শরীরের স্বাস্থ্য, এবং মনের বিশুদ্ধি শতগুণে বাড়িয়াছিল; তাই রূপও শতগুণে বাড়িয়াছিল। সদ্য প্রস্ফুটিত প্রাতঃ পুষ্পের যেমন পূর্ণ স্বাস্থ্য—কোথাও অপুষ্ট নয়, কোথাও অঙ্গহীন নয়, কোথাও বিবর্ণ নয়, সর্ব্বত্র মসৃণ, সম্পূর্ণ, শীতল, সুবর্ণ;—শ্রীর তেমনই স্বাস্থ্য;—শরীর সম্পূর্ণ, সেই জন্য শ্রীর প্রকৃতির শোভা মূর্ত্তিমতী। তার পর চিত্ত প্রশান্ত, ইন্দ্রিয়-

ক্ষোভশূন্য, চিত্তশূন্য, বাসনাশূন্য, ভক্তিময়, প্রীতিময়, দয়াময়।—আমেই সেই সৌন্দর্য্যের বিকার নাই, কোথাও একটা দুঃখের রেখা নাই, একটু মাত্র ইন্দ্রিয়ভোগের ছায়া নাই, কোথাও চিন্তার চিহ্ন নাই, সর্ব্বত্র সুমধুর, সহায় সুখময়—এ ভুবনেশ্বরী মূর্ত্তির কাছে সে সিংহবাহিনী মূর্ত্তি কোথায় দাঁড়ায়?”

সুশিক্ষার এই ফল—ধর্ম্মচর্য্যার এই পরিণাম।

এখন পাঠক বল দেখি, তোমার সূর্য্যমুখী, দলনী, ভ্রমর, কমলমণি—কেন আমরা তাহারও উচ্চে যাইব—সীতা সাবিত্রী, দ্রৌপদী দময়ন্তী, এইরূপ সৌন্দর্য্য প্রদর্শন করিয়াছেন কি? এ কথায় তোমরা অনেকে আমার উপর চটিবে জানি—কোথায় শ্রীর কি খুঁত আছে, না কি নির্লজ্জতা আছে, হিন্দুসমাজের নিয়মলঙ্ঘন আছে, তাহাই আমাকে শ্লেষের সহিত দেখাইতে যাইবে। তা যাহাই কর, আমি যাহা বলিলাম, তাহা পুনর্ব্বার বলিব শান্তি, শ্রী, প্রফুল্ল, নিশা ও জয়ন্তীর চরিত্র অন্য কোন দেশে কল্পিত হয় নাই, হইতেও পারে না; অন্য দেশে কেন, এরূপ চরিত্র ভারতেরও কোন কাব্যে এখন পর্য্যন্ত কল্পিত হয় নাই।

শিক্ষার তারতম্য অনুসারেই, কল্পিত আদর্শেরও তারতম্য হয়। যে পর্য্যন্ত দাম্পত্য প্রেমই জীবনের সার বলিয়া বিবেচনা করা যায়, সামান্য আহার-বিহার ঘরকন্নাকেই জীবনের লক্ষ্য বলিয়া ধরা যায় সেই পর্য্যন্তই সূর্য্যমুখী প্রভৃতি চরিত্র ভাল লাগে। শিক্ষা একটু উচ্চ হইলে, মন একটু উন্নত হইলে, সে ভালবাসার কাহিনী বালকের চাপল্য ভিন্ন অন্য কিছুই মনে হয় না। প্রৌঢ় পাঠকদিগকে এ কথায় সাক্ষী মানিতেছি।

বলা বাহুল্য জীবনের এই ভাগেই শ্রীর বিষম ভ্রান্তি ঘটিল। জীবনের এই ভাগেই শ্রী ‘ডাকিনী’র ন্যায় সীতারামের সহিত আচরণ করিয়া নিজকে পতনোন্মুখ করিল—এবং সীতারামকেও পতিত করাইল। দারুণ অদৃষ্টের বশে, জয়ন্তীর ন্যায় অমন একজন শুভানুধ্যায়িনী সত্ত্বেও শ্রীর ও সীতারামের এই দুর্দ্দশা ঘটিল। দুরদৃষ্ট বটে! কিন্তু পরিণাম ভাবিয়া ইহাকে শুভাদৃষ্টও বলা যায়। জীবনের এইভাগ “সীতারাম” উপন্যাসের যে ভাগে বর্ণিত হইয়াছে, তাহার আরম্ভে লিখিত আছে—

তৃতীয় খণ্ড।

রাত্রি।

ডাকিনী।

এখন শ্রীর জীবনের উপসংহার ভাগের কথা বলিব। এই উপসংহারে শ্রী নিজের ভ্রান্তি বুঝিতে পারিলেন—সীতারামের মহিষী হইয়া অনাসক্তভাবে তাঁহার রাজধর্ম্মের সহায়তা করাই যে তাঁহার কর্ত্তব্য, তাহা বুঝিতে পারিলেন।

বুঝিতে পারিলেন, জয়ন্তীর শিক্ষা তিনি প্রকৃত কর্ম্মক্ষেত্রে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। সহজে বুঝেন নাই—জয়ন্তী যখন তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলেন, তখনই বুঝিলেন। বুঝিয়া যাহা করিলেন—নিম্নোদ্ধৃত অংশ পড়িলেই তাহা বুঝিতে পারা যাইবে।

"রাজা তাহাদিগকে সেই বিষম সময়ে, তাঁহার আসন্নকালে সেই বেশে, সেই স্থানে সমাসীনা দেখিয়া কিছু ভীত হইলেন। বলিলেন, 'তোমরা আমার এই আসন্নকালে এখানে আসিয়া কেন বসিয়া আছ? তোমাদের এখনও কি মনস্কামনা সিদ্ধ হয় নাই?'

"জয়ন্তী ঈষৎ হাসিল! রাজা দেখিলেন, শ্রী গদগদকণ্ঠ সজললোচন কথা কহিতে ইচ্ছা করিতেছে, কিন্তু কথা কহিতে পারিতেছে না। রাজা তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। শ্রী কিছু বলিল না।

"রাজা তখন বলিলেন, "শ্রী! তোমারই অদৃষ্ট ফলিয়াছে। তুমিই আমার মৃত্যুর কারণ। তোমাকে প্রিয়প্রাণহন্ত্রী বলিয়া আগে ত্যাগ করিয়া ভালই করিয়াছিলাম। এখন অদৃষ্ট ফলিয়াছে—আর কেন আসিয়াছ?

"শ্রী। আমার অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম আছে—তাহা করিতে আসিয়াছি। আজ তোমার মৃত্যু উপস্থিত, তোমার সঙ্গে মরিতে আসিয়াছি।

রাজা। সন্ন্যাসিনী কি অনুমৃতা হয়?

শ্রী। সন্ন্যাসীই হউক, আর গৃহীই হউক, মরিবার অধিকার সকলেরই আছে।

"রাজা। সন্ন্যাসীর কর্ম্ম নাই। তুমি কর্ম্মত্যাগ করিয়াছ—তুমি আমার সঙ্গে মরিবে কেন? আমার সঙ্গে নন্দা যাইতে প্রস্তুত হইয়াছে। তুমি সন্ন্যাসধর্ম্ম পালন কর।

শ্রী। মহারাজ। যদি এত কাল আমার উপর রাগ করেন নাহি, তবে আজ আর রাগ করিবেন না। আমি আপনার কাছে যে অপরাধ করিয়াছি—তা এই আপনার আর আমার এই অসন্ন মৃত্যুকালে বুঝিয়াছি! এই আপনার পায়ে মাথা দিয়া,—

"এই বলিয়া শ্রী মঞ্চ হইতে নামিয়া, সীতারামের চরণের উপর পড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল—

'এই তোমার পায়ে হাত দিয়া বলিতেছি—আমি আর সন্ন্যাসিনী নই; আমার অপরাধ ক্ষমা করিবে। আমায় আবার গ্রহণ করিবে!

সী। তোমায় ত বড় আদরেই গ্রহণ করিয়াছিলাম—এখন আর ত গ্রহণের সময় নাই।

শ্রী। সময় আছে—আমার মরিবার সময় যথেষ্ট আছে।

সী। তুমিই আমার মহিষী।

শ্রী রাজার পদধূলি গ্রহণ করিল। জয়ন্তী বলিল, আমি ভিখারিণী, আশীর্ব্বাদ করিতেছি—আজ হইতে অনন্তকাল আপনারা উভয়ে জয়যুক্ত হইবেন।'

তার পরে শ্রী জয়ন্তীর উপদেশানুযায়ী কিরূপে সীতারামের মনে উৎসাহদি-

সম্পাদিত করিল, কিরূপ সেই ঘোর বিপদের সময় তাঁহার বাহ্যিক ও আন্তরিক উভয়বিধ শ্রেয়-সংসাধন করিল, পাঠক তাহা অবগত আছেন—এখানে আর তাহার উল্লেখ করিব না।

এখন উল্লেখ করিব—একটী কথা। শ্রীর চরিত্র দুর্ব্বোধ্য বলিয়াছি কেন।

যদি সীতারাম ও শ্রীর এই মিলনেই গ্রন্থ-সমাপ্তি হইত, তাহা হইলে শ্রীকে এক প্রকার বুঝিতাম। কিন্তু দেখ তাহার পরে শ্রী কি বলিতেছে। "আমরা সন্ন্যাসিনী, জীবনে ও মৃত্যুতে প্রভেদ দেখি না।" অন্যত্র "মহারাজ! রাজাদিগের অপেক্ষা সন্ন্যাসীদিগের মরণে ভয় কি বেশীই, (এখানে শ্রী সন্ন্যাসীশব্দে জয়ন্তী ও নিজেকে লক্ষ্য করিতেছে) এ সকল কথার তাৎপর্য্য কি? আবার শ্রী রাজার নিকট সন্ন্যাসিনী বলিয়া আত্মপরিচয় দিতেছে কেন? এও না হয় এক প্রকার বুঝিলাম, রাজাকে একটা উত্তর দিয়া অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম করা ত চাই—তাই নয় শ্রী এই কথা বলিল। না হয় বলিলাম, শ্রী এখনও সাবেক তাল সামলাইতে না পারিয়া এইরূপ বলিতেছে! কিন্তু শেষে যখন দেখিলাম, শ্রী আবার জয়ন্তীর সঙ্গে কোথায় অন্ধকারে মিশাইয়া গেল, কেহ জানিল না, তখন শ্রীকে কিছুই বুঝিলাম না। শ্রী কি ভয়ে আবারও পূর্ব্বের ন্যায় ভয়ে সীতারাম হইতে পলায়ন করিল! সে রকম ত কোন কথা কাব্যে পাইলাম না। আর পূর্ব্বে ভয় জন্মিবার যথেষ্ট কারণ ছিল বলিয়াই, ভয় জন্মিয়াছিল—এখন ত সে সকল কারণ অবর্ত্তমান। তবে শ্রী পলাইল কেন? একবার মনে হয়, সীতারামের বিপন্মুক্তি হওয়াতেই শ্রীর অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম শেষ হইয়াছিল—তাই সে শ্রী জয়ন্তীর সঙ্গে চলিয়া গেল। কিন্তু সেও ত ভাল কথা নহে! জয়ন্তী বলিয়াছিল স্বামি-সেবাই শ্রীর অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম। তখনও সীতারাম জীবিত, তবে শ্রী কেন আবার তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া গেল? শেষে এক প্রকার সিদ্ধান্ত করিতে হইল, সীতারাম তখন শ্রীকে আর চাহেন না—তাঁহারও মনে সন্ন্যাস উপস্থিত হইয়াছিল, তাই শ্রী আর তাঁহার নিকট গেল না; কিন্তু কথাটা যেন বড় ভাল লাগিল না—তাই বলিতেছিলাম, শ্রীর চরিত্র নিঃসংশয়ে বুঝিতে পারি নাই।

৩। অন্যান্য চরিত্রাবলী।

১। বক্তা।

বঙ্কিম বাবুর শেষ স্তরের উপন্যাস—আনন্দমঠ, দেবীচৌধুরাণী ও সীতারামকে একপ্রকার গীতার ব্যাখ্যা বলা যাইতে পারে। পাঠকবর্গ অবগত আছেন, গীতাতে সর্ব্ব শ্রেণীর লোকেরই কর্ত্তব্য কথিত আছে। অধিকারি-ভেদে এই কর্ত্তব্য বিভিন্ন। কাহারও পক্ষে বা কর্ম্ম-ত্যাগের প্রশংসা আছে—কাহারও পক্ষে বা কর্ম্মে আসক্তি-ত্যাগের প্রশংসা আছে—কাহারও পক্ষে নিরবচ্ছিন্ন ভক্তি-সংযুক্ত ভগবানে আত্মত্যাগের প্রশংসা আছে। এই বিবিধ পন্থা মধ্যে ভগবান্ ফলত্যাগ পূর্ব্বক বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান, সুখ দুঃখ প্রভৃতি ভগবানে সমর্পণ করিয়া যথা কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠানই সাধারণের পক্ষে ব্যবস্থা করিয়াছেন। কবি বঙ্কিম চন্দ্র তাঁহার পদাঙ্ক

সরণ করিয়া, ভগবন্নির্দ্দিষ্ট এই পন্থাই প্রকৃষ্ট পন্থা বলিয়া লোক সমাজে প্রচার করিতে যত্নবান ছিলেন।

এই পন্থায় একটি অতি সুন্দর ভাব আছে। এই পন্থায় যেন সংসার ও সন্ন্যাস মিশাইয়া ফেলিয়াছে। এই পন্থাবলম্বিগণের সংসারে থাকিয়া—সংসারের উন্নতি করিতে চেষ্টা করিতে হইবে—অথচ তাহার ফলাফলে নিস্পৃহ থাকিতে হইবে। যাহাকে বাহ্য জগৎ বলে, তাহার দিকেও এই পন্থাবলম্বীদিগের দৃষ্টি রাখিতে হইবে, আর যাহাকে অন্তর্জগৎ বলে, তাহার দিকে ও এই পন্থাবলম্বিদিগের দৃষ্টি রাখিতে হইবে। এই পন্থাবলম্বীগণের একদিকে ইংরাজ জাতিকে আদর্শস্থানীয় মনে করিয়া, বাহ্যজ্ঞানবিজ্ঞানের উন্নতির দিকে চেষ্টা করিতে হইবে—অন্যদিকে ভারতবর্ষীয় মুনিঋষিগণকে আদর্শ ভাবিয়া তাঁহাদের ন্যায় সংসারের সুখ দুঃখ তুচ্ছ করিতে—এবং আধ্যাত্মিক উন্নতি করিতে চেষ্টা করিতে হইবে। বাবু বঙ্কিম চন্দ্র মনে করিতেন—ইহাই মনুষ্যত্বের চরম আদর্শ। তিনি মনে করিতেন, ইংরাজ জাতির সহিত ভারতবাসীর অপূর্ব্ব সংমিশ্রণে এই আদর্শ স্থানীয় পুরুষ সৃষ্ট হইবে। তাই ভগবানের বিধানে আজ ভারতবর্ষে ধর্ম্ম ভিন্ন অন্য বিষয়ে ইংরাজ কর্ত্তা।

সে অবান্তর কথা যাউক—এখন জয়ন্তীর চরিত্র সমালোচনায় সে কথা বেশী খুলিয়া বলিবার বিশেষ প্রয়োজন নাই। এখন যাহা বলিয়াছি তাহাই যথেষ্ট হইবে। কর্ম্মফল ত্যাগ করিয়া বিবিধ কর্ম্মানুষ্ঠানই প্রকৃত ধর্ম্মাচরণ—ইহাই কবি বঙ্কিম চন্দ্র তাঁহার উচ্চ শ্রেণীস্থ উপাখ্যানে বিবৃত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, এই জয়ন্তী চরিত্রও সেই চেষ্টার ফল মাত্র।

যেমন শ্রীতে, তেমনই জয়ন্তীতে গ্রন্থকার সেই কর্ম্মযোগের ফলাফল দেখাইয়া গিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে, ফলত্যাগ পূর্ব্বক বিহিত কার্য্যের অনুষ্ঠানই সকলের পক্ষে শ্রেয়ঃ—তবে যে সংসারী তাহার বিহিত কর্ম্ম,ও যে সন্ন্যাসী তাহার বিহিত কর্ম্ম এক নহে। শ্রীর অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম কি ছিল, প্রস্তাবান্তরে বলিয়াছি—তাহার অনুষ্ঠানই শ্রীকে পতনোন্মুখ করিয়াছিল। কিন্তু শ্রী যাহাকে ধর্ম্ম বলিয়া মনে করিয়াছিল শ্রীর পক্ষে তাহা ধর্ম্ম না হইলেও, জয়ন্তীর পক্ষে তাহাই ধর্ম্ম ছিল—গ্রন্থকার ইহা পরিষ্কাররূপেই দেখাইয়া গিয়াছেন। শ্রী ও জয়ন্তী এই অর্থে পরস্পর (Duplicate) ছিল। সংসারী ও সন্ন্যাসীর অনুষ্ঠেয় কার্য্যে কি প্রভেদ—পতিহীনা ও পতিযুক্তার অনুষ্ঠেয় কার্য্যে কি প্রভেদ—সুশিক্ষিতা ও অর্দ্ধশিক্ষিতার অনুষ্ঠেয় কার্য্যে কি প্রভেদ শ্রী ও জয়ন্তী চরিত্রে তাহাই দেখিতে পাওয়া যায়।

জয়ন্তী সন্ন্যাসিনী—কিন্তু সন্ন্যাসিনী বলিলে সচরাচর যে ধারণা উপস্থিত হয়, জয়ন্তী সেরূপ সন্ন্যাসিনী নহেন। তিনি দিবারাত্রি গাছতলায় বসিয়া গঞ্জিকা সেবনে ও লোকের নিকট পয়সা আদায়ের চেষ্টায় রত থাকিতেন না। তিনি মনে করিতেন, যেখানে কর্ম্মানুষ্ঠানের আবশ্যক, সেখানে কেবলমাত্র ভগবানকে ডাকিয়া কর্ম্মানুষ্ঠানের আবশ্যকতা দূর করা যায় না। তিনি একস্থলে বলিয়াছেন—"আমি যদি নিজে সীতারামের

উদ্ধারের জন্য কোন চেষ্টা না করি, তবে ভগবান্ কেন আমার কথায় কর্ণপাত করিবেন?" তিনি কি প্রকার সন্ন্যাসিনী ছিলেন, ইহাতেই বুঝা যাইতে পারে।

তিনি প্রায় সংসারীর ন্যায়ই সংসারী লোকের সঙ্গে মিশিয়া স্বীয় কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে তৎপর ছিলেন। আমরা যেখানেই জয়ন্তীকে দেখিয়াছি, আমাদিগের মনে হইয়াছে জ্ঞান ও পবিত্রতা মূর্ত্তিমতী হইয়া যেন জয়ন্তীরূপে নরলোকে বিচরণ করিতেছে। যখন জয়ন্তী শ্রীকে অপূর্ব্ব জ্ঞান-শিক্ষা, নিষ্কাম কর্ম্মশিক্ষা দিয়াছেন, তখন তাঁহার জ্ঞান-জ্যোতি-বিভাসিত বদনমণ্ডল স্মরণ করিয়া আমরা বিস্ময়ে অভিভূত, আনন্দে পরিপ্লুত হইয়াছি। শুধুই কি জয়ন্তীর জ্ঞান-শিক্ষার প্রশংসা করিব? জয়ন্তীর যেমন জ্ঞান, তেমনই ভক্তি—জয়ন্তী যেমন দেবী তেমনই মানবী। শ্রীর প্রতি তাঁহার অদ্ভুত অনুরাগ—সীতারামের প্রতি তাঁহার অপূর্ব্ব স্নেহ, জনসাধারণের প্রতি তাঁহার অতুলনীয় বাৎসল্য—তাঁহার অনুষ্ঠেয় কর্ম্মবুদ্ধি, তাঁহার কৌশল, তাঁহার সরস কথোপকথন, সকলই অতুলনীয়। এ সকল কথা খুলিয়া দেখাইবার স্থান আমাদিগের নাই। তবে জয়ন্তী-জীবনের একটা ঘটনা গ্রন্থকার কিছু জমাইয়া লিখিয়াছেন, আমরা তাহারই সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু লিখিতে চাহি।

সেই ঘটনাটা—জয়ন্তীর বেত্রাঘাতাজ্ঞা। যে দিন রাজা সীতারাম পশুর ন্যায় ইন্দ্রিয়মদে মত্ত হইয়া জয়ন্তীকে বিবস্ত্রা করিয়া বেত্রাঘাতের আদেশ প্রদান করেন, জয়ন্তী-জীবনে সেই দিন অতি ভয়ঙ্কর দিন। সেই ভয়ঙ্কর দিনের দৃশ্যটি একবার পাঠকবর্গকে দেখাইতে চাহি।

কি জন্য জয়ন্তী এই শাস্তি স্বেচ্ছায় আপনার মাথা পাতিয়া লইয়াছিলেন, তাহা পাঠকবর্গ জ্ঞাত আছেন। জয়ন্তী রাজার আজ্ঞায় সভাস্থলে আনীত হইলেন রাজার আজ্ঞায় তাঁহার বেত্রাঘাত হইবে—কিন্তু তখনও তাঁহার "সেই উন্নত, সম্পূর্ণায়ত, ললিত মধুর অথচ উজ্জ্বল জ্যোতির্বিশিষ্ট দেহ; তাঁহার দেবোপম স্থৈর্য্য—দেবদুর্লভ শান্তি; সকলেই বিমুগ্ধ হইয়া দেখিতে লাগিল। দেখিল জয়ন্তীর নবরবিকরপ্রোদ্ভিন্ন পদ্মবৎ অপূর্ব্ব প্রফুল্ল মুখ; এখনও অধরভরা মৃদু মধুর মন্দস্নিগ্ধ বিনম্র হাস্য—সর্ব্ব বিপৎসংহারিণী শক্তির পরিচয় স্বরূপ সেই স্নিগ্ধ মধুর মন্দহাস্য! দেখিয়া অনেকে দেবতা জ্ঞানে যুক্তকরে প্রণাম করিল।" শুধু প্রণাম করিল, তাহা নহে। তখন তাঁহাকে দেখিয়া সভাস্থলে এমনই জয় শব্দ উঠিল—যে রাজ পুরী কম্পিতা হইল। চণ্ডালের হস্ত হইতে বেত্র খসিয়া পড়িল। প্রথমে এইরূপে জয়ন্তীর জয়লাভ হইল।

এই জয়লাভে জয়ন্তীর একটা পরীক্ষাও হইয়া গেল। সেই কথাটা এখন বলিব

যাহার যেমন শিক্ষা, তাহার তেমনই পরীক্ষা হইয়া থাকে। স্থূল পাপে প্রলোভন দেখাইয়া আমাদিগের মত সাধারণ মানবেরই পরীক্ষা হইতে পারে, কিন্তু জয়ন্তীর মত লোকের পরীক্ষা সেরূপে হইতে পারে না। কাহার মন কেমন বিশুদ্ধ, তাহা সেই মনের বিশুদ্ধতানষ্টকারী অবস্থার সংঘর্ষণেই পরিব্যক্ত হয়

এখন জয়ন্তীর মনের বিশুদ্ধতা স্থূল পাপে বিনষ্ট করিতে পারে না। তাই গ্রন্থকার এইখানে একটা সূক্ষ্ম পাপের প্রলোভন আনিয়া উপস্থিত করিলেন। সে প্রলোভনটা এই।—

দেখ, অহঙ্কার একটা অতি প্রধান রিপু। এ রিপু যেমন তোমায় আমায় আক্রমণ করিয়া থাকে, তেমন সূক্ষ্মভাবে মহামহারথিগণকেও আক্রমণ করিতে পারে। তোমরা আমরা না হয়, ধনের, মানের, বিদ্যার, যশের, রূপের, বলের অহঙ্কার করি,—মহারথিগণ না হয়, ধর্ম্মের পবিত্রতারই অহঙ্কার করিয়া থাকেন। তা' এই অহঙ্কারের বিষয় যাহাই হউক, সকল সময়েই ইহা নিন্দনীয়। দ্রৌপদীর অহঙ্কার, সত্যভামার অহঙ্কারও নিন্দনীয়। জয়ন্তীর এই অহঙ্কার করিবার একটা সময় উপস্থিত হইল। যখন তাঁহাকে দেখিয়া সমবেত জনমণ্ডলী ঘোর সহানুভূতি প্রদর্শনপূর্ব্বক জয়নাদে পুরী কম্পমান করিল, যখন জয়নাদে বেত্রাঘাত করিতে উদ্যত চণ্ডালের হস্ত হইতে বেত্র খসিয়া পড়িল—তখন জয়ন্তীর মনে একটা ধর্ম্মের অহঙ্কার উপস্থিত হওয়াই সম্ভব; কিন্তু জয়ন্তীর তাহা জন্মিল না—জয়ন্তী তখন মনে মনে বলিতে লাগিলেন—'জয় জগদীশ্বর! তোমারই জয়! তুমি আপনি এই লোকারণ্য, আপনিই এই লোকের কণ্ঠে থাকিয়া, আপনার জয়বাদ আপনিই দিতেছ! জয় ভগবান তোমারই জয়! আমি কে?' দেখিলে পাঠক, কেমন এই পরীক্ষা—কেমন এই পরীক্ষায় জয়ন্তীর জয়লাভ!

এই বিষম পরীক্ষায় প্রথমে জয়ন্তী জয়লাভ করিলেন বটে—কিন্তু একটু পরেই তাঁহার সেই জয় রহিল না। রাজা চণ্ডালকে জয়ন্তীকে বেত মারিতে আজ্ঞা দিলেন—চণ্ডাল অস্বীকার করিল। রাজা বজ্রের ন্যায় শব্দ করিয়া চণ্ডালকে বলিলেন 'তোমাকে শূলে যাইতে হইবে'—চণ্ডাল, যোড় হাত করিয়া বলিল 'মহারাজের হুকুমে তা পারিব। এ পারিব না।'

এই সকল দেখিয়া শুনিয়া জয়ন্তীর কিছু অহঙ্কার জন্মিল—কিছু ক্ষমতা-প্রদর্শনের ইচ্ছাবশতঃ জয়ন্তী চণ্ডালকে বলিলেন 'বাছা! তুমি আমার জন্য কেন দুঃখ পাইবে। আমি সন্ন্যাসিনী, আমার কিছুতেই সুখ দুঃখ নাই, বেত্রে আমার কি হইবে! আর বিবস্ত্র—সন্ন্যাসীর পক্ষে সবস্ত্র বিবস্ত্র সমান। কেন দুঃখ পাও—বেত তোল।" চণ্ডাল স্বীকার করিল না। "জয়ন্তী তখন চণ্ডালকে বলিল 'বাছা! স্ত্রীলোকের কথা বলিয়া বিশ্বাস করিলে না—এই তার প্রমাণ দেখ।' এই বলিয়া জয়ন্তী আপনি বেত উঠাইয়া লইয়া, দক্ষিণ হস্তে দৃঢ় মুষ্টিতে তাহা ধরিল। পরে সেই জনসমারোহ সমক্ষে, আপনার প্রফুল্ল-পদ্মসন্নিভ রক্তপ্রভ ক্ষুদ্র করপল্লব পাতিয়া, সবলে তাহাতে বেত্রাঘাত করিল। বেত, মাংস কাটিয়া লইয়া উঠিল—হাতে রক্তের স্রোত বহিল। জয়ন্তীর গৈরিক বস্ত্র এবং মঞ্চতল তাহাতে প্লাবিত হইল।" * * * "জয়ন্তী মৃদু হাসিয়া চণ্ডালকে বলিল, 'দেখিলে বাছা! সন্ন্যাসিনীকে কি লাগে? তোমার ভয় কি?"

এই প্রদর্শনের কিছুমাত্র আবশ্যকতা ছিল না। এই অনাবশ্যক ক্ষমতা-

প্রদর্শন অহঙ্কারের ফল ফলতঃ চারিদিক দেখিয়া শুনিয়া, মনের পবিত্রতার জোরে জয়ন্তীর একটু অহঙ্কারই হইয়াছিল। এই অহঙ্কার-প্রভাবে জয়ন্তী জনসমারোহকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—

"রাজাজ্ঞায় এই মঞ্চের উপর বিবস্ত্র হইব। তোমাদের মধ্যে যে সতীপুত্র হইবে সেই আপনার মাতাকে স্মরণ করিয়া ক্ষণকালের জন্য চক্ষু আবৃত করুক —ইত্যাদি।"

প্রথম যখন এ সকল পড়িতে ছিলাম, তখন জয়ন্তী যে কোন পাপানুষ্ঠান করিতেছিল, এমন স্বপ্নেও ভাবি নাই। গ্রন্থকার এই কার্য্যের পাপটুকু এমনই সূক্ষ্ম করিয়া রাখিয়া দিয়াছেন! কিন্তু শেষে সব বুঝিলাম—বুঝিলাম যে ভগবানের নিকট সহজে কড়া ক্রান্তিও রেয়াইত হয় না।

যেমন জয়ন্তীর মনে একটু অহঙ্কার কলঙ্ক উপস্থিত হইল—অমনি তাহার ফল স্বরূপ লজ্জা আসিয়া তাহাকে আক্রমণ করিল। জয়ন্তী আর কথা রক্ষা করিতে পারে না—বিবস্ত্র হইতে পারে না। তখন জয়ন্তী সব বুঝিল, তাহার চক্ষে জল আসিল। তখন সেই পাপ ক্ষালনার্থ "যুক্ত করে, পবিত্রচিত্তে, জয়ন্তী আত্মাকে সমহিত করিয়া মনে মনে ডাকিতে লাগিল, 'দীনবন্ধু! আজ রক্ষা কর! মনে করিয়াছিলাম, বুঝি এ পৃথিবীর সুখদুঃখে জলাঞ্জলি দিয়াছি, কিন্তু হে দর্পহারি! আমার দর্প চূর্ণ হইয়াছে, আমায় আজ রক্ষা কর। নারীদেহ কেন দিয়াছিলে, প্রভু! সব সুখদুঃখ বিসর্জ্জন করা যায়, কিন্তু নারীদেহ থাকিতে লজ্জা বিসর্জ্জন করা যায় না। তাই আমি কাতরে ডাকিতেছি জগন্নাথ। আজ রক্ষা কর।"

অন্যত্র—

"জয়ন্তী প্রসন্ন মনে মহম্মদপুর হইতে নির্গত হইল। দুঃখ কিছুই নাই—মনে বড় সুখ। পথে চলিতে চলিতে মনে মনে ডাকিতে লাগিল—'জয় জগন্নাথ! তোমার দয়া অনন্ত। তোমার মহিমার পার নাই। তোমাকে যে না জানে, যে না ভাবে, সেইভাবে বিপদ! বিপদ কাহাকে বলে প্রভু? তাহা বলিতে পারি না; তুমি যাহাতে আমাকে ফেলিয়াছিলে, তাহা পরম সম্পদ! আমি এতদিন এমন করিয়া বুঝিতে পারি নাই যে আমি ধর্ম্মভ্রষ্টা, কেন না আমি বৃথা গর্ব্বে গর্ব্বিতা, বৃথা অভিমানে অভিমানিনী, অহঙ্কারবিমূঢ়া।"

জয়ন্তীর এই প্রার্থনায় তাহার অহঙ্কারের ইঙ্গিতটা আছে। গ্রন্থকার এই অহঙ্কারের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন;—তিনি যেন বলিয়াছেন, যে পর্য্যন্ত নারীদেহ থাকিবে, সে পর্য্যন্ত লজ্জা পরিত্যাগ করা সম্ভবপর নহে—জয়ন্তীরও নহে। জয়ন্তী কিন্তু তাহা ত্যাগ করিতে পারিবেন এই মনে করিয়া, পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি বলিয়াছিলেন। জয়ন্তীর এইরূপ ভাবই তাহার অহঙ্কারের ফল। *

* এই সম্বন্ধে শ্রীর মুখে গ্রন্থকার এইরূপ বলিয়াছেন।

শ্রী। সন্ন্যাসিনীই হউক, যেই হউক, মানুষ মানুষই চিরকাল থাকিবে। আমি তোমাকে দেবী বলিয়াই জানি, কিন্তু যখন তুমিও লোকালয়ে

তা কথাটা যে দিক দিয়াই দেখ, ফল একই। নারীদেহে লজ্জাত্যাগ অসম্ভব—জয়ন্তী তাহা মনে না করিয়া সেই লজ্জাত্যাগের সংকল্পে ভাগবানের নিকট অপরাধী হইয়াছিলেন বলায়ও যে ফল—অনাবশ্যক ভাবে ধর্ম্মবল প্রদর্শন করিয়া জয়ন্তী ভগবানের নিকট অপরাধী হইয়াছিলেন, এরূপ বলায়ও সেই ফল। দুইই বলিতে পারা যায়। এই অপরাধের ফল জয়ন্তীজীবনে অতি উজ্জ্বল ভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। যেমন উন্নত চরিত্র, তেমনই সূক্ষ্ম পাপ, তেমনই সুন্দর প্রদর্শন! ইহার সকলই সুন্দর!

জয়ন্তীর সহিত ভগবানের কি প্রকার সম্বন্ধ ছিল, ভগবান তাঁহার কথা কিরূপ শুনিতেন—ফল দেখিয়া তাহা সিদ্ধান্ত করা যায়। মৃত মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন বলিতেন, প্রার্থনা তাহাকেই বলে, যে প্রার্থনা পূরণ হয়—চাওয়া তাহাকেই বলে যে চাওয়ায় পাওয়া যায়। এই জয়ন্তী যখন যাহা চাহিয়াছেন, তখনই প্রায় তাহা পাইয়াছেন। তাঁহার সীতারামের রাজ্যরক্ষার কথা, গঙ্গারামের উদ্ধারের কথা, রমার কলঙ্কমোচনের কথা, সেই মহাভয়ঙ্কর দিনের সেই বিপদ হইতে উদ্ধারের কথা নাই বা বলিলাম—এই এক দিনের কথা বলিলেই যথেষ্ট হইতে পারে। সেই দিনকার কথা গ্রন্থকার এইরূপে লিখিয়াছেন।

"জয়ন্তী জগদীশ্বরকে সম্মুখে রাখিয়া, তাঁহার সঙ্গে কথোপকথন করিতে শিখিয়াছিল। মনের সকল কথা খুলিয়া বিশ্বপিতার নিকট বলিতে শিখিয়াছিল। বালিকা যেমন মা বাপের নিকট আবদার করে, জয়ন্তীও তেমনি সেই পরম পিতামাতার নিকট আবদার করিতে শিখিয়াছিল। এখন জয়ন্তী একটা আবদার লইল। আবদার, সীতারামের জন্য। সীতারামের যে মতি গতি, সীতারাম ত উৎসন্ন যায় বিলম্ব নাই। তার কি রক্ষা নাই? অনন্ত দয়ার আধারে তাহার জন্য কি একটু দয়া নাই? জয়ন্তী তাই ভাবিতেছিল। ভাবিতেছিল 'আমি জানি, ডাকিলে তিনি অবশ্য শুনেন।' সীতারাম ডাকে না—ডাকিতে ভুলিয়া গিয়াছে—নহিলে এমন করিয়া ডুবিবে কেন? জানি, পাপীর দণ্ডই এই, যে সে দয়াময়কে ভুলিয়া যায়। তাই সীতারাম তাঁকে ডাকিতে ভুলিয়া গিয়াছে, আর ডাকে না। তা, সে না ডাকুক আমি তার হইয়া জগদীশ্বরকে ডাকিলে তিনি কি শুনিবেন না? আমি যদি বাপের কাছে আবদার করি, যে এই পাপিষ্ঠ সীতারামকে পাপ হইতে মোচন কর, তবে কি তিনি শুনিবেন না? জয় জগন্নাথ! তোমার নামের জয়! সীতারামকে উদ্ধার করিতে হইবে।"

এই প্রার্থনা ভগবান কিরূপ শুনিয়াছিলেন, তাহা পাঠকবর্গ জ্ঞাত আছেন। বলা বাহুল্য যে সীতারামের প্রধান উদ্ধারকর্ত্তা এই জয়ন্তী। এই জয়ন্তী নিজে এবং তাহার উপদেশানুযায়ী শ্রী, এই দুই জনেই সীতারামের কর্ণে আবার সেই মধুর হরিনাম প্রদান করাতেই সীতারামের উদ্ধার

লৌকিক লজ্জায় অভিভূত হইয়াছিলে, তখন আমার সন্ন্যাস বিভ্রংশের কথা কেন বল।

গ্রন্থকারের ভাব, মানুষ মনুষ্যত্বের বিকাশ করিতেই সমর্থ, ধ্বংস করিতে সমর্থ নহে।

হইয়াছিল। এই উদ্ধারে যেমন নাম-মাহাত্ম্য, তেমনই জয়ন্তীর ভক্তিমূলক প্রার্থনামাহাত্ম্য প্রকাশিত হইয়াছে। সীতারাম যেমন জ্ঞানমূলক তেমনই ভক্তিপ্রধান উপন্যাস! জয়ন্তী যেমনই জ্ঞান তেমনই ভক্তি।

ভগবানে জয়ন্তীর বিশ্বাস অনন্ত। জয়ন্তীর বিশ্বাস—ভগবানকে যে ডাকিতে জানে, তাহার আর বিপদ থাকে না। জয়ন্তীর বিশ্বাস ভগবৎপ্রসঙ্গে যে কর্ণপাত করে, তাহার দুর্ম্মতি অচিরেই বিদূরিত হয়। তাই জয়ন্তী বলিতেছে—'আমি জানি, ডাকিলে তিনি শুনেন—ইত্যাদি" তাই জয়ন্তী বলিয়াছে—

'তোমার মুখের কথা, তাই মনোযোগ দিতেন। তোমার মুখ পানে হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকিতেন, তোমার রূপে ও কণ্ঠে মুগ্ধ হইয়া থাকিতেন, ভগবৎপ্রসঙ্গ তাঁর কানে প্রবেশ করিত না। তিনি কোন দিন তোমার এ সকল কথার কিছু উত্তর করিয়াছিলেন কি? কোন দিন কোন তত্ত্বের মীমাংসা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন কি? হরিনামে কোন দিন উৎসাহ দেখিয়াছিলে কি?

"শ্রী। না। তা, বড় লক্ষ্য করি নাই।

জয়ন্তী। তবে সে মনোযোগ তোমার লাবণ্যের প্রতি—ভগবৎপ্রসঙ্গে নয়।"

ভগবৎপ্রসঙ্গে মনোযোগ দিলে—এত দিন ভগবৎপ্রসঙ্গ শুনিয়াও কি সীতারাম অমন হইতে পারিতেন? তাই জয়ন্তী বলিয়াছেন, সীতারাম প্রকৃত পক্ষে ভগবৎপ্রসঙ্গে মন দেন নাই—মন দিয়াছেন শ্রীর রূপলাবণ্য প্রতি।

জয়ন্তী ধর্ম্মের উদ্ধারের জন্য অবশ্যাচারীর প্রাণ নিজহস্তে বিনাশ করিতে প্রস্তুত, কিন্তু ধর্ম্মের উদ্ধার হইলে, প্রাণিহত্যাকে মহাপাপ বলিয়া বিবেচনা করেন। এই জন্যই একদিন তিনি স্বহস্তে গঙ্গারামকে বধ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, আর একদিন রাজার নিকটে সেই অপরাধীর প্রাণভিক্ষা প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

ফলতঃ এই জয়ন্তীর চিত্র—সর্ব্বত্রই পূর্ণ—সর্ব্বত্রই বিকশিত, সর্ব্বত্রই জ্যোতিপূর্ণ। এ মহান্ চরিত্র—ভাবিতেও মনে অসীম বিস্ময় ও আনন্দ উপস্থিত হয়।

হায় মা! আবার কবে তোমায় এদেশে দেখিব মা!

এই শ্রী সীতারাম দম্পতি প্রতি তুমি যে দয়া দেখাইলে, কবে এই নিঃসহায় পতিত, পতনোন্মুখ বঙ্গীয় হিন্দুদম্পতি প্রতি তুমি আবার সেই দয়া দেখাইবে মা?

২। রমা।

বুঝি চক্ষের জল জমাইয়া বিধাতা রমাকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। রমা কাঁদিতে আসিয়াছিল, কাঁদিয়া কাঁদিয়াই চলিয়া গেল। যেমন আরম্ভ, তেমনই উপসংহার যেমন প্রকাশ, তেমনই বিনাশ। বাঙ্গালী এক ফোঁটা চক্ষের জল দেখিলে কাঁদিয়া আকুল হয়, এমন নিরবচ্ছিন্ন অশ্রুবর্ষণ দেখিলে, তাহাতে সহানুভূতি কেনই না দেখাইবে? তাই রমা বাঙ্গালী পাঠকের বড়ই মনোরম চরিত্র।

রমা বাঙ্গালীর মনোরম চিত্র বলিয়াই গ্রন্থকার গ্রন্থমধ্যে এত যত্ন করিয়া তাহাকে স্থান দিয়াছেন। কিন্তু তাহায় কি কঠোর

প্রকৃতি, তিনি রমার চক্ষের জলে আপনার সূক্ষ্ম বিচার ভুলিয়া যান নাই। রমার অশ্রুপাতে তাঁহারও অশ্রুপাত হইয়াছে, কিন্তু সে অশ্রুপাত রমার জন্য তত নহে, যত রমার সহানুভাবক আমাদিগের জন্য। কথাটা খুলিয়াই বলিতেছি।

যেখানে পাপ অতি স্থূল—এমনই স্থূল যে সকলেই তাহাকে পাপ বলিয়া বুঝিতে পারে, সেখানেও বেশী চক্ষের জল দেখিলে আমাদিগের সহানুভূতি প্রকাশিত হয়—অমন পাপী রাবণ ও দুর্য্যোধনের পতনেও আমরা অশ্রুবর্ষণ করি। অশ্রুবর্ষণ করি সত্য, কিন্তু লোকটাকে ভাল বলিতে প্রবৃত্তি হয় না। কিন্তু যেখানে পাপ এত সূক্ষ্ম যে, প্রকাশিত হইলেও সমাজ দোষ বা ত্রুটি মাত্র তাহার নামান্তর, সেখানে চক্ষের জল দেখিলে আমাদিগের সমস্ত সহানুভূতি সেই দিকেই প্রধাবিত হয়। তখন শুদ্ধ আমরা অশ্রুবর্ষণ করিয়া ক্ষান্ত হই না—আমরা সেই চরিত্রের ত্রুটি সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়া তাহাকে মনোহর বলিয়া প্রশংসাও করিয়া থাকি—স্থানবিশেষে তাহাকে আদর্শ বলিতেও কুণ্ঠিত হই না। মহাকবি বঙ্কিমচন্দ্র আমাদিগের এই ত্রুটি অবলোকন করিয়া, তদীয় উপন্যাসে এইরূপ কতকগুলি সূক্ষ্ম পাপ দেখাইয়া, তাহার স্থূল ফল প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার উদ্দেশ্য—সেই সকল সূক্ষ্ম পাপের বীজেও কিরূপ প্রকাণ্ড অশুভপ্রস্থ বৃক্ষ জন্মিতে পারে, তাহা প্রদর্শন করা। এই জন্য তাঁহার উপন্যাসে ভ্রমর, রমা, শ্রীর ন্যায় চরিত্র প্রকটিত হইয়াছে। এমন সূক্ষ্ম ত্রুটি অবলম্বনে এমন চিত্র জগতের আর কোন কাব্যে আছে কি না সন্দেহ। বলিয়াছি ত, আমাদিগকে হিন্দু কবি কেবল মাত্র আমোদ জন্মাইতে উপন্যাস লিখেন নাই—তাঁহার উপন্যাস এক প্রকার ধর্ম্মতত্ত্ব।

রমা বড় খাঁটি জিনিস। খাঁটি—অর্থাৎ হিন্দু সমাজে সচরাচর যেরূপ রমণী দেখা যায়, ঠিক সেইরূপ। সহরের শিক্ষিতার কথা ছাড়িয়া দেও—পল্লীগ্রামে গৃহে গৃহে সহস্র সহস্র চিত্রই এই রমার ন্যায়। এমনই অপূর্ব্ব সরলতা—এমনই অপরিমেয় পতি-প্রেম—এমনই অগাধ পুত্রস্নেহ। যদি পৃথিবীটা শুদ্ধ একটা খেলার জায়গা হইত—যদি বিলাস ভিন্ন পৃথিবীতে আর কোন কার্য্য না থাকিত, তবে এই রমার চরিত্রই আমরা আদর্শ চরিত্র মনে করিতে পারিতাম। যদি অনন্ত কালও সীতারাম এই রমার ভাল বাসায় স্নান-পান সমাধা করিতে চাহিতেন, সে অগাধ সলিলরাশি কিছুতেই শুকাইত না—সে অনন্ত প্রেম-ভাণ্ডার কিছুতেই শূন্য হইত না। কিন্তু বিধাতার বিধানে জগতে কেবলমাত্র ভালবাসাই জীবনের একমাত্র প্রাপণীয় পদার্থ নহে—প্রণয়সলিলে সন্তরণই সংসারের একমাত্র কার্য্য নহে। ভালবাসায় সুখ যাহাই থাকুক, মানুষ কেবল ভালবাসা পাইয়াই সুখী হইতে পারে না—তাই একমাত্র সৌখিন বাবুদিগের নিকট ভিন্ন একমাত্র ভালবাসাময়ী রমণীই জগতের আদর্শস্থানীয়া বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না।

এ জগতে স্বামি-প্রতি স্ত্রীর কর্ত্তব্য কি, তাহাও আমরা প্রস্তাবান্তরে প্রদর্শন করিয়াছি—পতিকে স্বধর্ম্মপালনে সহায়তা করাই প্রকৃত সহধর্ম্মিণীর কার্য্য, একথা

পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এই কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে বিমুখ পত্নীকে লইয়া ঘরকন্না করিলে কি হয়, সীতারাম উপন্যাসে তাহা জলন্ত অক্ষরে লিখিত হইয়াছে। একদিকে সর্ব্ব-প্রকারে সুশিক্ষিতা শ্রী—অন্যদিকে স্থূল-বুদ্ধি অশিক্ষিতা রমা, মধ্যে বুদ্ধিমতী কিন্তু অপূর্ণশিক্ষিতা নন্দা বড়ই সুন্দররূপে এ তত্ত্ব দেখাইয়া দিয়াছে। বাঙ্গালীর এ তত্ত্ব জানা একান্ত আবশ্যক, তাই মহাকবি সুসময়ে এই চিত্র কয়েকটি আঁকিয়া পাঠক-বর্গকে উপহার দিয়াছেন এবং তিনি দেখাইয়া গিয়াছেন যে, 'স্বামী স্ত্রী পরস্পারে ভালবাসাই দাম্পত্যসুখ নহে, একাভিসন্ধি-সহৃদয়তা—ইহাই দাম্পত্য সুখ।'

রমার চরিত্র তাহার প্রথম পরিচয়েই অভিব্যক্ত হইয়াছে। গ্রন্থকার প্রথমেই বলিয়াছেন—

"রমা বড় ছোট মেয়েটি; জলে ধোয়া যুঁই ফুলের মত বড় কোমল প্রকৃতি। তাহার চক্ষে এই জগতের যাহা কিছু সকলেই দুর্জ্ঞেয় বিষম পদার্থ—সকলই তাহার কাছে ভয়ের বিষয়। বিবাদে রমার বড় ভয়। সীতারামের সাহসকে ও বীর্য্যকে রমার বড় ভয়। * * * রমা সীতারামকে পীড়াপীড়ি করিয়া ধরিল যে ফৌজদারের পায়ে গিয়া কাঁদিয়া পড়—মুসলমান দয়া করিয়া ক্ষমা করিবে। সীতারাম সে কথায় কান দিলেন না—রমাও আহার নিদ্রা ত্যাগ করিল। সীতারাম বুঝাইলেন যে, তিনি মুসলমানের কাছে কোন অপরাধ করেন নাই—রমা তত বুঝিতে পারিল না। শ্রাবণ মাসের মত, রাত্রি দিন রমার চক্ষে জলধারা বহিতে লাগিল বিরক্ত হইয়া সীতারাম আর তত রমার দিগে আসিতেন না।"

পরবর্ত্তী ঘটনা এই পরিচয়ের বিশ্লেষণ মাত্র।

যাঁহারা স্বাভাবিক চিত্র (?) আঁকিতে জানেন না বলিয়া বঙ্কিম বাবুর প্রতি দোষার্পণ করেন, তাঁহারা দেখুন ঠিক স্বাভাবিক (যেমন হিন্দু সমাজে আছে ঠিক তেমনই) এই রমার চিত্র হইয়াছে কি না।

রমার সেই ভয়—'হয় ত তাহারা (মুসলমানগণ) বর্শা দিয়া খোঁচাইয়া রমাকে মারিয়া ফেলিবে, নয় ত তরবারি দিয়া টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া ফেলিবে, নয় ত বন্দুক দিয়া গুলি করিয়া-মারিয়া ফেলিবে। খোঁপা ধরিয়া ছাদের উপর হইতে ফেলিয়া দিবে।' রমার সেই সান্ত্বনা—"এ সময়ে সীতা-রাম দিল্লী গিয়াছেন ভালই হইয়াছে যদি এ সময় মুসলমান আসিয়া সকলকে মারিয়া ফেলে, তাহা হইলেও সীতারাম বাঁচিয়া গেলেন" তাহার সেই চিন্তা—"তবে কি না, রমা তাঁকে আর দেখিতে পাইবে না, তা না পাইল, আর জন্মে দেখিবে।" আবার রমার সেই ভয় "আমি যদি মরি,আমায় যদি মারিয়া ফেলে, তবে আমার ছেলেকে কে মানুষ করিবে? তা ছেলে না হয়, দিদিকে দিয়া যাইব। কিন্তু সতীনের হাতে ছেলে দিয়া যাওয়া যায় না, সৎমায় কি সতীনপোকে যত্ন করে?" সেই মুসলমানের ভয়ে প্রথমে

ভাবনা, পরে শয্যাগত হওয়া, সেই মুসলমান-হাতে রাজ্য সঁপিয়া দিয়া প্রাণ ভিক্ষা মাগিবার ইচ্ছা, সেই প্রা নি—হে ঠাকুর? মহম্মদ প্রুরছারেখারে যাক্‌—আমরা মুসলমানের অনুগত হইয়া নির্ব্বিঘ্নে দিনপাত করি" সেই গঙ্গারামের সহিত পরামর্শ—ইহার সকলই অতি সুন্দর, অতি প্রকৃত, অতি মনোহর। কিন্তু এসকল অতি পরিষ্কার সৌন্দর্য্য ব্যাখ্যা করা আমাদিগের কার্য্য নহে। আমরা সেই দরবারের বিচারের দিনের কথাই কিছু বলিব।

রমার যেমন ভীরু স্বভাব, যেমন কোমল অন্তঃকরণ—সেই দরবারের ব্যাপারটা তাহাতে কিছু অস্বাভাবিক বলিয়া আপাততঃ বোধ হইতে পারে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে উহাতে অস্বাভাবিকতা বা অসামঞ্জস্য কিছুই নাই। স্থলবিশেষে অমন ভীরু চরিত্রও কিরূপে সাহস দেখাইতে পারে, অবস্থা-বিশেষে অমন অল্পভাষী রমণীও কিরূপ বাগ্মীতার স্রোত বহাইতে পারে, অবস্থাবিশেষে কিরূপে অমন কোমল প্রাণা কামিনীও অমন সিংহীর ন্যায় তেজস্বিনী হইতে পারে, এই দরবার ঘটাইয়া কবি আমাদিগকে তাহাই দেখাইয়াছেন। সে কথাটা এই :—

বঙ্গীয় হিন্দু রমণীর কোমলতা, নিরীহতা জগৎপ্রসিদ্ধ। যে জাতির পুরুষই অন্যদেশস্থ রমণীর অপেক্ষা হীনবল, হীনতেজ বলিয়া খ্যাত, সে দেশে রমণীর শৌর্য্যবীর্য্য কোথা হইতে আসিবে? কিন্তু এই হীনবল, ভীরু, নিস্তেজ, নিরীহ রমণীরও এক অবস্থায় সিংহের ন্যায় পরাক্রম হয়, ফণিনীর ন্যায় ক্রোধ হয়। যখন কোন বলবান পাষণ্ড পশুবলে দৃপ্ত হইয়া এই নিরীহ অবলার প্রতি অত্যাচার করিতে উদ্যত হয়, তখন তাহার প্রবল পরাক্রমও এই অন্তুত অবলার পরাক্রমের নিকট খর্ব্ব হইয়া যায়। ইতিহাস এ সত্যের সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছে। সে সময়ে এই অবলার আর প্রাণের মমতা থাকে না—যখন প্রাণের মমতা বিলুপ্ত হয়, তখন শৌর্য্য কেনই বা না আসিবে? সতীত্ব হিন্দুরমণীর এমনই জিনিষ।

হিন্দুরমণী শুধু যে অসতীত্বকে ঘৃণা করে, এমন নহে—সেই অসতীত্বের অপবাদকেও অন্তরের সহিত অবজ্ঞা করে। এই অপবাদ হইতে মৃত্যুও ভাল, হিন্দুরমণীর ইহাই ধারণা। বাঙ্গালী পুরুষ ভারতের অন্যান্য জাতির নিকট শৌর্য্যে বীর্য্যে হীন হইলেও বাঙ্গালী রমণী এসম্বন্ধে ভারতের অন্য কোন বিভাগস্থ হিন্দুরমণী অপেক্ষা নিকৃষ্টা নহে। অতি নিরীহ, প্রকৃতই অবলা রমার সেই দিনকার কার্য্যে ইহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। যে রমা, মুসলমান আসিয়া তাহার ছেলেকে মারিয়া ফেলিবে, এই ভয়ে অষ্ট প্রহর ভীত থাকিত, সেই রমাকে যখন নন্দা জিজ্ঞাসা করিলেন "আমরা রাজমহিষী, সূর্য্যও আমাদিগকে দেখিতে পান না। এই সমস্ত নগরবাসীর সম্মুখে বাহির হইয়া, মুক্ত কণ্ঠে তুমি এই সকল কথা কি বলিতে পারিবে? পার ত সব কলঙ্ক হইতে আমরা মুক্ত হই।" "রমা তখন সিংহীর মত গর্জ্জিয়া উঠিয়া বলিল, 'তুমি সমস্ত নগরবাসী কি বলিতেছ দিদি! সমস্ত জগতের লোক জমা হয়।

আমি জগতের লোকের সম্মুখে মুক্তকণ্ঠে এ কথা বলিব। নন্দা। "পারিবে?" রমা 'পারিব—নহিলে মরিব।' এইরূপ বলিল। তার পরে মনে কর, রমার সেই দিনকার সেই বাগ্মিতা—'সেই পরিষ্কার, স্বর্গীয় অপ্সরানিন্দিত তিনগ্রামসংমিলিত মনো-মুগ্ধকর সঙ্গীতের মত' সেই দিনকার সেই কথা। সেই স্তরে স্তরে উত্থিত সেই বাক্য তরঙ্গ—সেই তরঙ্গের শেষ উচ্ছ্বাস—দেখিবে কি চমৎকার ব্যাপার। এই মনোহর ব্যাপারের মধ্যে রমার সেই পুত্রমুখদর্শনে সাহসবৃদ্ধি, সেই যে পুত্রের অনিষ্ট আশঙ্কায় তিনি এমন গুরুতর কার্য্য করিতেছিলেন, তাহারই মুখ দর্শন করিয়া ততোধিক গুরুতর কার্য্য সম্পাদন—সকলই অতি সুন্দর। ইহাতে রমার কলঙ্ক ভয়—পুত্রবাৎসল্য তুল্যরূপেই প্রকটিত হইল।

রমার যে কি দোষ ছিল, তাহা গ্রন্থকারই বলিয়া দিয়াছেন। তিনি একস্থলে বলিয়াছেন রমা স্থূলবুদ্ধি—অন্যত্র বলিয়াছেন, স্বামী পুত্র প্রতি তাহার অনুচিত স্নেহাধিক্যই তাহার দোষ। এও অবশ্য দোষ সন্দেহ নাই—কিন্তু রমা যে নন্দা বা শ্রী হইতে সীতারামকে বেশী ভালবাসিত এমন কথা আমরা স্বীকার করিব না। সুতরাং অনুচিত স্নেহাধিক্যই রমার দোষ বলিতে আমাদিগের ইচ্ছা হয় না। আমরা বলিব রমার দোষ—অমার্জ্জিত ভালবাসা। রমা ভালবাসিত সত্য কিন্তু যে ভালবাসার বলে মাতা সন্তানকে কুপথ্য প্রদান করিয়া জীবন নষ্ট করেন এ সেই জাতীয় ভালবাসা। এ ভালবাসা কোন স্থানে পরিমাণে অধিক দেখিলেও, ইহার গুণ বিবেচনায় ইহাকে প্রশংসনীয় মনে করি না। রমার এই অমার্জ্জিত ভালবাসাই—সীতারামকে আবাহন করিয়া তুলিয়াছিল—সত্যই সীতারাম ভাবিতেন 'গুরুদেব আমাকে রমার ভালবাসা হইতে উদ্ধার কর।'

রমা মরিল কেন, এ কথা অনেকেই জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের মনের ভাব মৃত্যু একটা শাস্তি, তবে রমার ন্যায় স্ত্রীলোকের পক্ষে সে শাস্তির ব্যবস্থা হইল কেন? বলা বাহুল্য রমার অনুচিত ও অমার্জ্জিত ভালবাসাই সেই মৃত্যু আনয়ন করিয়াছিল। নন্দা ত মরিল না। যদি মৃত্যু শাস্তিই হয়, তবে রমার নিজ দোষেই সেই শাস্তি ভোগ করিতে হইল, একথা বলিলে দোষ কি? চক্ষের জলের প্রাবল্য দেখিয়া গ্রন্থকার এ কথা ভুলেন নাই, তাই গ্রন্থমধ্যে রমার মৃত্যু দেখিতে পাইলাম। এ মৃত্যু সীতারামেরও শাস্তি বটে।

নন্দা—

নন্দা সূর্য্যমুখী জাতীয় স্ত্রীচরিত্র। "মাতার মত স্নেহ, কন্যার মত ভক্তি দাসীর মত সেবা, সীতারাম সকলই নন্দার কাছে পাইতেছিলেন।" কিন্তু নগেন্দ্রনাথ সূর্য্যমুখীতে যেমন সন্তুষ্ট ছিলেন, সীতারাম নন্দাতে তেমন সন্তুষ্ট ছিলেন না। গ্রন্থকার তাহার কারণ এই বলিয়াছেন—'কিন্তু সহধর্ম্মিনী কই? যে তাঁহার উচ্চ আশায় আশাবতী, হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষার ভাগিনী, কঠিন কার্য্যের সহায়, সঙ্কটে মন্ত্রী, বিপদে সাহসদায়িনী, জয়ে আনন্দময়ী সে কই? বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মী তাহা; কিন্তু সমরে সিংহবাহিনী কই?

এ কথা অতি পরিষ্কার—বিশ্লেষণের আবশ্যকতা নাই।

গঙ্গারাম নিরবচ্ছিন্ন পাপের চিত্র। সমালোচকগণ যাহাকে কাব্য-সৌন্দর্য্য বলেন, তাহা গঙ্গারামে প্রকাশিত না হইয়াছে, এমন নহে—তবু এ পাপচরিত্র ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণে আমাদিগের প্রবৃত্তি হইতেছে না। এই চিত্র শ্লেচ্ছ Iago জাতীয়। অন্য চরিত্রের ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজনীয়।

ভাষা—বর্ণনা—ঘটনা—ইত্যাদি।

ভাষা—

সীতারাম উপন্যাসের ভাষা বড়ই প্রাঞ্জল। ফলতঃ বঙ্কিম বাবুর ভাষা যেন ক্রমশঃ অধিকতর প্রাঞ্জল হইয়া আসিতেছিল। বঙ্কিম বাবু বলিয়াছেন—রচনার চারিটি গুণ—(১) বিশুদ্ধি (২)অর্থ-ব্যক্তি (৩)প্রাঞ্জলতা (৪) অলঙ্কার। তাঁহার এই সীতারাম রচনায় প্রথমোক্ত তিনটি গুণ সমধিক পরিমাণেই প্রকাশিত হইয়াছে। বিশেষতঃ এই প্রাঞ্জলতা গুণ। তিনি লিখিয়া গিয়াছেন—"প্রাঞ্জলতা রচনার বড় গুণ।"

বর্ণনা—

সীতারাম উপন্যাসে ললিতগিরির যে একটী বর্ণনা আছে, তাহা অতীব হৃদয়গ্রাহিনী। যেমন প্রাকৃতির শোভা তেমনই তাহাতে কবির হৃদয়েরও শোভা সুন্দর প্রতিফলিত হইয়াছে।* আর মনোহর তাঁহার হৃদয়ের উচ্ছ্বাস বর্ণনা যখন কোন ভাবে তাঁহার কোন চরিত্র উচ্ছ্বসিত হয়, তখন সেই উচ্ছ্বাসগুলি তিনি এমনই সুন্দর করিয়া পরিব্যক্ত করেন, যে সেই বর্ণনাও যেন সেই ভাবের ন্যায় উচ্ছ্বাসময়ী হইয়া তরঙ্গে তরঙ্গে ক্রীড়া করিতে থাকে। সীতারামের যখন অন্তিমে ধর্ম্মোচ্ছ্বাস হইল—অনেকদিনের পরে যখন তিনি আবার হরিনাম স্মরণ করিলেন, যখন জয়ন্তী ও শ্রী তাঁহাকে হরিনাম শুনাইতে লাগিল, তখনকার বর্ণনা পড়িলে, শরীর রোমাঞ্চিত ও অন্তর ভক্তিরসার্দ্র হয়, এবং গ্রন্থকারকে ভক্তির সহিত প্রণাম করিতে ইচ্ছা হয়।

সীতারাম উপন্যাসের ঘটনায় তত জাঁক জমক নাই।

ইতিবৃত্ত।

বাঙ্গালা ১২৯৩ সালের ১৭ই ফাল্গুন "সীতারাম" উপন্যাস পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশিত হয়। ইহার পূর্ব্বে "প্রচার" নামক মাসিক পত্রে ইহার কিয়দংশ প্রচারিত হইয়াছিল। অদ্যাবধি ইহার ৩টি সংস্করণ হইয়াছে। এই গ্রন্থ লিখিবার সময়ে গ্রন্থকারের ধর্ম্মমত বিশেষ পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। তিনি এই সময়ে "প্রচারে" গীতার আলোচনা করিতেছিলেন এবং "নবজীবনে" "ধর্ম্মতত্ত্ব" লিখিতেছিলেন। তাঁহার "কৃষ্ণ চরিত্র"ও

কতকাংশ এই সময়ে "প্রচারে" প্রকাশিত হয়।

বাঙ্গলী হিন্দুদিগের নিকটে বড়ই ঘটনাপূর্ণ এই সময়। ওদিকে পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি প্রাচীন হিন্দু আচার ব্যবহার ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে বিবিধ বক্তৃতা দ্বারা অনেক হিন্দুকে মোহিত করিতেছিলেন, এদিকে আমাদিগের কবি বঙ্কিমচন্দ্র প্রাচীন হিন্দুধর্ম্মকে কিছু সংস্কৃত করিয়া প্রচারের চেষ্টায় স্বীয় অসাধারণ প্রতিভা নিয়োজিত করিতেছিলেন—ওদিকে মনস্বী অক্ষয়চন্দ্র "নবজীবনে" হিন্দুধর্ম্মের বিচিত্র আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য্য দেখাইয়া নব্য হিন্দু পাঠককে বিস্মিত ও পুলকিত করিতেছিলেন। "সীতারাম" উপন্যাস, সেই হিন্দুধর্ম্মাভ্যুদয়কালের লেখা।

পরিশিষ্ট।*

উপন্যাসের স্তর বিভাগ।

বঙ্কিম বাবুর উপন্যাসসমূহ প্রধানতঃ তিন স্তরে বিভক্ত। দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী ইহার প্রথম স্তরের অন্তর্নিবিষ্ট; আনন্দমঠ, দেবী-চৌধুরাণী, সীতারাম ইহার শেষ বা তৃতীয় স্তরভুক্ত। অন্যান্য উপন্যাসগুলি ইহার দ্বিতীয় স্তরে স্থিত। আমরা বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম ভাগে ইহার প্রথম স্তরের উপন্যাস গ্রহণ করিয়াছি; দ্বিতীয় স্তরের কতক উপন্যাস বঙ্কিমচন্দ্র দ্বিতীয় ভাগের একার্দ্ধে গৃহীত হইয়াছে, অব-শিষ্টগুলি দ্বিতীয় ভাগের অপরার্দ্ধে গৃহীত হইবে।

এই স্তর-বিভাগের মূল সূত্র আমরা পাঠকবর্গকে নিম্নে দেখাইতেছি।

পূর্ব্বোক্ত প্রথম স্তরের উপন্যাসে আমরা দেখিতে পাই, গ্রন্থকার বিশেষ কোন উদ্দেশ্য-সাধনার্থ এই উপন্যাসগুলি লিখেন নাই। যেমন বিষবৃক্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ উপন্যাস সীতারাম পর্য্যন্ত সকল উপন্যাসেই তাঁহার একটা বিশেষ উদ্দেশ্য পরিলক্ষিত হয়, এই তিনখানি উপন্যাসে সেরূপ কোন উদ্দেশ্য দেখিতে পাওয়া যায় না। পাঠকের চিত্তরঞ্জন মাত্র এই গ্রন্থত্রয়ের উদ্দেশ্য ছিল, এইরূপ বোধ হয়। এই চিত্তরঞ্জন উপন্যাস মাত্রেরই একটি লক্ষ্য, সুতরাং এই সাধা-রণ উদ্দেশ্যটাকে উদ্দেশ্যমধ্যে পরিগণিত না করিয়া আমরা বলিয়াছি যে বঙ্কিম

---

* বঙ্কিম বাবুর কৃষ্ণকান্তের উইল ও চন্দ্রশেখর নামক উপন্যাসদ্বয় যে গ্রন্থে বিশ্লেষিত, ব্যাখ্যাত ও সমালোচিত হয়, সেই গ্রন্থের ভূমিকায় আমরা লিখিয়াছিলাম—

"পরিশিষ্টে আমরা তাঁহার অনুমতি লইয়া তাঁহার একটি প্রতিমূর্ত্তি ও তাঁহার একটি সংক্ষিপ্ত অথচ নাতিক্ষুদ্র জীবন-চরিত সংযোজনা করিয়া দিব, এইরূপ মানস করিয়াছি। * * * পরিশিষ্টে আরও একটি বিষয় থাকিবে। সেটী ইংরাজী ও বাঙ্গালা নভেলের একটি ক্ষুদ্র ইতিহাস। এই ইতিহাস উপলক্ষে আমরা বঙ্কিম বাবুর উপ-ন্যাসগুলি তুলনায় সমালোচনা করিয়া তাঁহার প্রতিভার বিকাশ দেখাইব।"

কিন্তু এখন আমরা এই সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিতে পারিলাম না। বঙ্কিম বাবুর জীবনচরিত লিখিতে নানা কারণে আমরা এখন অগ্রসর হইতে পারিতেছি না। তাঁহার ছবি দেওয়াও ব্যয়সাধ্য— তাহাতেও আমরা এখন অসমর্থ।

বলিলে ক্ষতি নাই, বঙ্কিম বাবু জীবিত থাকিতে স্বয়ং আমাদিগকে তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি ছাপাইয়া দিবেন, এরূপ অনুগ্রহ-সূচক কথা বলিয়াছিলেন। জীবনচরিত সম্বন্ধেও তিনি অনেক কথা আমাদিগকে বলিয়া দিবেন, এরূপ বলিয়াছিলেন। এখন তিনি জীবিত নাই— কাজেই মনের সে আশা পূর্ণ করিতে পারিলাম না। পাঠকগণ ক্ষমা করিবেন।

বাবুর প্রথম তিন খানি উপন্যাসের বিশেষ কোন উদ্দেশ্য নাই। তবে চিত্ত-রঞ্জন করিতে গিয়া কোন কোন স্থলে চরিত্র-বিশেষে কোন কোন উদ্দেশ্যের ছায়া পতিত হইয়াছে বটে ; কিন্তু তাহা মূলগ্রন্থের উদ্দেশ্য বলিয়া ধরা যায় না। কেবল মাত্র সরস ও সুপাঠ্য আখ্যায়িকা, নিষ্কাম সৌন্দর্য্য-সৃষ্টিই এই উপন্যাসত্রয়ে গ্রন্থকারের একমাত্র চেষ্টা ছিল। এই সময়েই বনবিহারিণী কপালকুণ্ডলা তাঁহার কল্পনা-প্রসূনে গঠিতা হইয়া লোকলোচ-নের দৃষ্টিপথে পতিত হয়। অনেকে বলিয়া থাকেন, এই "কপালকুণ্ডলা"ই তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। ফলতঃ উদ্দাম বয়সই কবিকল্পনার বিলাস-লীলাকাল। প্রৌঢ় বয়সে, কল্পনার অনন্তপ্রসারিণী বহির্ব্যাপিনী দৃষ্টি সীমাবদ্ধা ও অন্তর্ভে-দিনী দৃষ্টিতে পরিণতা হয়।

এই প্রথমস্তরের উপন্যাস বাঙ্গালা ১২৭১ সাল হইতে ১২৭৬ সাল মধ্যে লিখিত। ১২৪৫ সালে বঙ্কিম বাবুর জন্ম হয়। সুতরাং ২৭ বৎসর বয়স হইতে ৩২ বৎসর বয়সের মধ্যে এই উপন্যাসগুলি রচিত হইয়াছিল।

প্রথম স্তরের উপন্যাস পাঠ করিয়া যখন পাঠকগণ বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত উপন্যাসপাঠে বিশেষ আসক্তি প্রকাশ করিলেন, তখন কবি উপন্যাসের লক্ষ্য বিস্তৃত করিয়া চিত্তরঞ্জনপূর্ব্বক লোক শিক্ষা প্রদানই উপন্যাসের উদ্দেশ্য স্বরূপ গ্রহণ করিলেন। প্রথমে তিনি উপন্যাস লিখিয়া পাঠক সংগ্রহ করিয়া-ছিলেন, পরে সেই পাঠকদিগকে শিক্ষাপ্রদানই তাঁহার উপন্যাসের ব্রত হইল। লোকশিক্ষাই তাঁহার দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরের উপন্যাসের মুখ্য উদ্দেশ্য।

এই লোকশিক্ষার বিষয় অনন্ত—কবি এই অনন্ত বিষয় হইতে প্রধানতঃ একটি বিষয় গ্রহণ করিলেন। যৌবন কালে মানবের যে বৃত্তিটি হৃদয়ে বেশী গোলযোগ করিয়া থাকে, সেই প্রেমই বল, আর কামই বল, অথবা সেই প্রেম ও কাম মিশ্রিত এক অদ্ভুত যৌগিক পদার্থই বল, তাহাই গ্রন্থকার এই দ্বিতীয় স্তরের উপন্যাসে বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করিলেন। তিনি এই স্তরের উপন্যাসে পূর্ব্বোক্ত বৃত্তির বীজ, বৃক্ষ, ও ফল পাঠক-বর্গকে উজ্জ্বল রূপে পরীক্ষা করিয়া দেখাইলেন। বলা বাহুল্য যে, পুরুষ ও স্ত্রীজাতির আকর্ষণ প্রধানতঃ এই বৃত্তি হইতেই উৎপন্ন। এই বৃত্তিকে অবলম্বন করিয়াই জগতে বিবাহের উৎপত্তি ও সমাজ-বন্ধনের সৃষ্টি, সুতরাং এই বৃত্তির আলোচনায় সমাজ এবং স্বামী ও স্ত্রীর সম্বন্ধও এই উপন্যাসে সম্যক্‌রূপে আলো-চিত হইয়াছে।

এই স্তরের উপন্যাসের আরম্ভ ১২৭৯ সালে, পরিসমাপ্তি ১২৮৮ সালের পূর্ব্বে কোন এক সময়ে। গ্রন্থকার ৩৪ বর্ষ বয়স হইতে ৪৩ বর্ষ বয়স পর্য্যন্ত এই স্তরের উপন্যাস লিখিয়াছিলেন।

তাঁহার তৃতীয় স্তরের উপন্যাসের বিষয়ও লোকশিক্ষা। কিন্তু সেই লোক-শিক্ষার বিষয়রূপে দ্বিতীয় স্তরে তিনি যাহা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তৃতীয় স্তরে তাহা কিছু বিস্তারিত হইল। এই তৃতীয়

স্তরে তিনি পাঠকবর্গকে শিখাইতে চাহিলেন, সমগ্র জীবনের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বা ধর্ম্মাধর্ম্ম। পূর্ব্বে মানবজীবনের একটী মাত্র সমস্যা—এক প্রেমবৃত্তির দিকেই তাঁহার দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল—এখন মানব জীবনের সমস্যাসমষ্টি—“কি করিব?” ইহাতেই তাঁহার দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত হইল। আনন্দমঠ, দেবীচৌধুরাণী, সীতারাম এই তিনখানি উপন্যাসে এই সমস্যারই ব্যাখ্যা—এই ধর্ম্মতত্ত্বই প্রদর্শিত হইয়াছে। মানবের অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম কি—তাহা কিরূপে পালন করিতে হয়—তাহাতে বাধা বিঘ্ন কিরূপ উপস্থিত হইতে পারে—এই সকল উপন্যাসে সেই সকল কথা বিবৃত হইয়াছে।

এই স্তরের উপন্যাসের আরম্ভ ১২৮৮ সালে; ইহার পরিসমাপ্তির কথা কিছু বলিতে পারি না। কারণ এ উদ্দেশ্য পরিত্যাগ করিয়া গ্রন্থকার পরে অন্য কোন উদ্দেশে নূতন কোন উপন্যাস লিখিয়া যান নাই।

উপন্যাসের উদ্দেশ্য।

(প্রতীচ্য ও প্রাচ্য)

প্রতীচ্য সমালোচকগণ বলেন, চিত্তরঞ্জন অথবা চরিত্রাদিগত সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি দ্বারা চিত্তরঞ্জনই উপন্যাসের প্রধান লক্ষ্য। আমাদিগের মহাকবি বলিয়াছেন, মানবজীবনের কঠিন সমস্যা ব্যাখ্যা দ্বারা লোকশিক্ষাই উপন্যাসের প্রধান লক্ষ্য। চিত্তরঞ্জন সেই লোকশিক্ষা সৌকর্য্যার্থ গৌণ লক্ষ্য মাত্র। এই প্রাচ্য ও প্রাতীচ্য মত দুইটি সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করিতে চাহি।

প্রাতীচ্য সমালোচকগণের মত বিশ্লেষণ করিলে আমরা দেখিতে পাই—তাঁহাদিগের মতে, উপন্যাসাদি ভোগের বিষয়। সুখবিশেষের উৎপত্তিই ইহার প্রথম ও শেষ কার্য্য. উপন্যাসকে ভোগের বিষয় করিতে হইলে, সুখ-প্রদানে সমর্থ করিতে হইলে, চরিত্রগত সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি আবশ্যক। উপন্যাস মানব চরিত্র লইয়া—সেই চরিত্রের পূর্ণতা—স্বাভাবিকতাই তাহার চরিত্রগত সৌন্দর্য্য। সুতরাং উপন্যাসের বিচারে, চরিত্রের এই পূর্ণতা ও স্বাভাবিকতা রূপসৌন্দর্য্যই প্রাতীচ্য পণ্ডিতগণ সর্ব্বাগ্রে দেখিয়া থাকেন। প্রতীচ্যগণ-মতে উপন্যাসকার সুখবিধাতা সুতরাং সম্মানার্হ।

প্রাচ্য সমালোচকগণ বলেন, এমন বলিতে না পারিলেও বলিতে পারি, প্রাচ্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাসকার বলেন যে, উপন্যাস কেবল মাত্র ভোগের বিষয় নহে। মুখ্যতঃ সুখবিশেষের উৎপত্তি জন্য উপন্যাস লিখিত হয় না—কোন গ্রন্থই সে জন্য লিখিত হওয়া উচিত নহে।

গ্রন্থলেখার উদ্দেশ্য—সুতরাং উপন্যাসের উদ্দেশ্য লোকশিক্ষা। উপন্যাস মানব-চরিত্রের কাহিনী লইয়া—সুতরাং উপন্যাসের উদ্দেশ্য এই মানবচরিত্রের কাহিনী লইয়া লোকশিক্ষা—এই মানব-জীবনের সমস্যা ব্যাখ্যা দ্বারা লোকশিক্ষা। উপন্যাস ভোগের বিষয় বটে—কিন্তু তাহার প্রথম ও শেষ কার্য্য এ ভোগ নহে। চিত্তরঞ্জন করিতে করিতে লোকশিক্ষা প্রদানই উপন্যাসের উদ্দেশ্য—চিত্তরঞ্জন করিতে করিতে মানবজীবনের কঠিন সমস্যা ব্যাখ্যা করিয়া শিক্ষাপ্রদানই উপন্যাসের উদ্দেশ্য। কোন চরিত্র পূর্ণ, বিকশিত ও স্বাভাবিক হইলেই তাহা শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের উপযোগী চরিত্র হইতে পারে না। উপন্যাসের উপযোগী শ্রেষ্ঠ চরিত্র এমন হওয়া চাই, যাহাতে মানবজীবনের সূক্ষ্ম ও জটিল সমস্যাগুলি—যাহা অমীমাংসিত থাকিয়া মানবের কর্ত্তব্য সম্পাদনে বিঘ্ন জন্মাইয়া থাকে, তাহা বিবৃত বিশ্লেষিত ও মীমাংসিত হইতে পারে।

বলা বাহুল্য, উপন্যাসের লক্ষ্যভেদে এই দুই প্রকার মত হওয়া অবশ্যম্ভাবী। যাঁহারা চিত্তরঞ্জনই উপন্যাসের সর্ব্বপ্রধান লক্ষ্য বলিয়া গ্রহণ করেন, তাঁহারা চরিত্রকে পূর্ণ, বিকশিত, স্বাভাবিক করিয়া সহজেই লোকের সুখ জন্মাইতে চেষ্টা করিবেন। আর যাঁহারা মানব-জীবনের কঠিন সমস্যা ব্যাখ্যা দ্বারা শিক্ষাপ্রদানই উপন্যাসের লক্ষ্য বলিয়া গ্রহণ করেন, তাঁহারা সর্ব্বাগ্রে সেই সমস্যার ব্যাখ্যার প্রতিই দৃষ্টি রাখিবেন, তৎসঙ্গে যথাসম্ভব চিত্তরঞ্জনের চেষ্টাও অবশ্য থাকিবে।

এই মতের বিভিন্নতা জন্য আমাদের প্রাচ্য সাহিত্য-ক্ষেত্রে বড়ই দলাদলি দেখিতে পাই। অথবা দলাদলিই বা বলি কেন, আমাদের দেশস্থ শিক্ষিত প্রায় সকল লোককেই দেখিতে পাই, তাঁহারা প্রতীচ্য মতাবলম্বী হইয়া বঙ্কিম বাবুর শেষের উপন্যাসগুলির বিরুদ্ধে অনেক কথা কহিয়া থাকেন। ইহা কিছু বিস্ময়ের বিষয় নহে। যাঁহারা আমাদের দেশে শিক্ষিত, তাঁহারা ইংরাজী সমালোচনাদি ও কাব্যাদিতে অভিজ্ঞ। প্রাচ্য সমালোচনার গ্রন্থ ত পূর্ব্বে ছিল না—এখনই বা আছে, এমন বলিতে পারিতেছি কই—প্রাচ্য কাব্যাদিতেও এ কথার তেমন আলোচনা নাই। তাই আমাদের দেশস্থ সুশিক্ষিতগণ সেই প্রতীচ্য মত অবলম্বন করিয়াই বঙ্কিম বাবুর উপন্যাসের সমালোচনা করিয়া থাকেন। ইঁহাদিগেরই মতে 'কপালকুণ্ডলা' বঙ্কিম বাবুর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস। কিন্তু আমাদিগের মহাকবি চিরকালই বঙ্গীয় পাঠক ও সমালোচকগণের অগ্রে চলিয়াছেন। তিনি উপন্যাসের এই প্রতীচ্য লক্ষ্য পরিবর্ত্তন করিয়া তাহাকে একটি প্রাচ্য লক্ষ্য দিয়াছেন। এ লক্ষ্য সম্পূর্ণই নূতন।

এই লক্ষ্যদ্বয় বিশ্লেষণ করিয়া আমরা দেখিতে পাই, জীবনের ভিন্ন ভিন্ন প্রকার কর্ত্তব্য-জ্ঞান এই লক্ষ্যদ্বয়ের মূলে অবস্থান করিতেছে। সেই কথাটি খুলিয়া দেখাইতেছি।

এই দেখুন, প্রতীচ্য জাতি। ইঁহাদের ধর্ম্মশাস্ত্রের কি উপদেশ, তাহা জানি না; কিন্তু ইহা জানি যে, ঐহিক সুখই ইহাদের জীবনের প্রধান লক্ষ্য। কেবলমাত্র

এ কথা বলিলেও, ইহাদের এ ভাবের বিশেষত্বটুকু পরিস্ফুট হইতেছে না—ইহাদের বিশেষত্ব পরিস্ফুট করিতে হইলে বলিতে হইবে যে, সচরাচর সকল লোকেই যে সকল কার্য্যে সুখ দেখিয়া থাকে, সেই সকল কার্য্যানুষ্ঠানজনিত সুখপ্রাপ্তিই ইহাদের জীবনের লক্ষ্য। অর্থাৎ হিন্দুশাস্ত্রে যাহাকে রাজস সুখ বলিয়া থাকে—বিষয়েন্দ্রিয়-সংযোগজন্য সেই সুখই ইহাদিগের সাধারণের প্রধান লক্ষ্য। প্রতীচ্য জাতির মধ্যে যাঁহারা অতি উচ্চ শ্রেণীর, তাঁহারা এই সুখটীকে ঘসিয়া মাজিয়া, মর্য়্যালীটি, হিউমানিটি প্রভৃতির ফিল্‌টারে পরিশোধিত করিয়া ব্যবহার করিয়া থাকেন—ব্যবহার করিতে চাহেন। সুতরাং যাহা কিছু পূর্ব্বোক্তরূপে মার্জ্জিত সুখজনক তাহাই প্রতীচ্য নীতিবিজ্ঞানের মতে একমাত্র প্রাপনীয় পদার্থ। এই সুখবুদ্ধিবশতঃই ইংরাজ বলিতেছেন—গ্রন্থ দুই প্রকার। এক প্রকার শিক্ষাদায়ক—যেমন বিজ্ঞান, ইতিহাস প্রভৃতি। আর এক প্রকার সুখদায়ক—যেমন কাব্য, উপন্যাস ইত্যাদি। সুখ জন্মাইবার ক্ষমতা ও মাত্রা দ্বারাই তাঁহারা কাব্য, উপন্যাস প্রভৃতি সুখদায়ক গ্রন্থের বিচার করিয়া থাকেন। তাই তাঁহাদের মতে, কাব্য উপন্যাস প্রভৃতিতে শিক্ষার সংস্পর্শ থাকা ভাল নহে, কারণ তাহা সুখের বিঘ্নই জন্মাইয়া থাকে। ফলতঃ তাঁহারা মনে করেন, সুখজন্মানই বা চিত্তরঞ্জনই কাব্য-উপন্যাসের প্রধান লক্ষ্য। তাঁহারা বলেন, "এই লক্ষ্য বজায় রাখিয়া তাহার সঙ্গে শিক্ষা দিতে পার ক্ষতি নাই—কিন্তু সাবধান যেন শিক্ষার মাত্রা বাড়াইয়া বা প্রকৃতি বিসদৃশ করিয়া এই সুখের হানি জন্মাইও না। তাহা হইলে, কাব্যের উদ্দেশ্য নষ্ট হইবে—বই ভাল হইবে না।"

কিন্তু এ দিকে দেখ, প্রাচ্য জাতি। এই জাতির সুখের ও কর্ত্তব্যের ধারণাই মূলগত কত বিভিন্ন। হিন্দু মনে করেন, দুঃখসম্ভাবনা-বর্জ্জিত চিরকাল সেব্য সুখ বা আনন্দই মানব জীবনের প্রধান লক্ষ্য। তাঁহারা বলেন, এই সুখ বা আনন্দলাভার্থে মানব-জীবনের প্রত্যেক কার্য্য অনুষ্ঠিত হওয়া কর্ত্তব্য। এ আনন্দ—এ বিমল সুখ সহজে ও প্রথমেই কেহ লাভ করিতে পারে না; অথচ মানবমাত্রই চিরসুখাভিলাষী। তাই হিন্দুর ব্যবস্থা, ইংরাজ যাহাকে সুখ বলেন, সেই সুখভোগের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃত যে সাত্বিক সুখ বা সুখদুঃখভাবরহিত আনন্দ তাহাই পাইবার জন্য মানবকে কার্য্য করিতে হইবে। ইহাই হিন্দুর ধর্ম্মানুষ্ঠান—ইহাই হিন্দুর শাস্ত্রোপদেশ। অমার্জ্জিত সুখ ত্যাগ কর—মার্জ্জিত সুখও ভোগ করিতে করিতে ত্যাগের চেষ্টা কর—সুখদুঃখ রহিত যে আনন্দ তাহাই পাইতে যত্নবান হও, ইহাই হিন্দুর ধর্ম্মের কথা। এই শেষোক্ত সুখ যিনি উপভোগ করিতেছেন, হিন্দু তাঁহাকেই ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ বলেন এবং হিন্দু ইহাও বলেন যে ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ হইলেই এই সুখ উপভোগ করিতে সমর্থ হওয়া যায়। এ কথা ভাল করিয়া বলিতে গেলে, অনেক বলিতে হয়। তাই আমরা সংক্ষেপে ইহাই বলিতে চাহি যে, এই শ্রেণীর লোকের সকল কার্য্যের মূল লক্ষ্যই সেই এক ধর্ম্মানুষ্ঠান। ইহাদের মতে এমন কোন কার্য্যই অনুষ্ঠেয় নহে, যাহা এই

ধর্ম্মের, এই আনন্দলাভের বিরোধী। তাই হিন্দুর আহার, বিহার, প্রভৃতি সকল কার্য্যই সেই একাভিমুখী। আহার—বিহারেও যাহাদিগের মূল লক্ষ্য ধর্ম্ম—গ্রন্থ লিখিতেও তাঁহাদিগের মূল লক্ষ্য ধর্ম্ম ভিন্ন আর কি হইতে পারে? আবার ধর্ম্মার্থ গ্রন্থ লিখিতে হইলে তাহা লোকশিক্ষার্থ ভিন্ন হইবার সম্ভাবনা নাই। গ্রন্থ লেখা হয়, অন্যের পাঠের জন্য। এই লেখা তখনই ধর্ম্ম হয়, যখন অন্যে তাহা পড়িয়া ধর্ম্মানুষ্ঠানে তৎপর হয় বা ধর্ম্মানুষ্ঠানের আবশ্যকতা উপলব্ধি করে সুতরাং হিন্দুর মতে লোকশিক্ষা ভিন্ন গ্রন্থ-প্রণয়নের অন্য প্রকার উদ্দেশ্যই হইতে পারে না।

এই মতদ্বয়ের মধ্যে কোন্‌টি ভাল, তাহা পাঠকবর্গ বিচার করিয়া দেখিবেন। আমরা সে সম্বন্ধে কিছুই বলিতে চাহি না।

প্রাচ্য শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে কেহ কেহ প্রতীচ্য মতটীকে একটু প্রাচ্য ছাঁচে ঢালিয়া উপন্যাস-সমালোচনা করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, সৌন্দর্য্য সৃষ্ট দ্বারা চিত্তরঞ্জনই উপন্যাসের উদ্দেশ্য। এই সৌন্দর্য্য উপভোগেই মানব-মন বিশোধিত হইতে পারে! উপন্যাস লেখা পাঠকের ধর্ম্মপ্রবৃত্তি বিকাশের জন্যই বটে—তাহাই ইহার প্রধান লক্ষ্যও বটে, কিন্তু সেই ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সৌন্দর্য্য আলোচনাতেই বিকশিত হইতে পারে ও হইয়া থাকে।

এই মত[১] প্রাচ্য ও প্রতীচ্য মতের সম্মিলন বলিয়া প্রথমে ভ্রান্তি হয়। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এ মতটি সম্পূর্ণই প্রতীচ্য। প্রাচ্য যুক্তি বলে প্রতীচ্য মত সমর্থনের চেষ্টাতেই এই মতের উৎপত্তি হইয়াছে। আমরা জানি, বাঙ্গালার কোন সুবিখ্যাত লেখক এই মত সমর্থন করিয়া থাকেন। আমরা এই মত সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিয়া আমাদের এই প্রবন্ধ শেষ করিব। বেশী লিখিবার সাধ থাকিলেই বা তাহা পারিতেছি কই?

এই মতাবলম্বী সমালোচক পাঠকের ধর্ম্মপ্রবৃত্তি বিকাশ জন্য সৌন্দর্য্যের আলোচনাই উপন্যাসের বিষয় মনে করিয়া থাকেন। যদি সৌন্দর্য্যের আলোচনায় ধর্ম্মপ্রবৃত্তি বস্তুতঃই বিকশিত হয়, তবে আমাদিগের প্রাচ্য কবিও অবশ্য ইহাকে উপন্যাসের বিষয় মধ্যে গ্রহণ করিতে পারেন। কিন্তু প্রতীচ্যগণ যে সকলভাবকে সৌন্দর্য্য বলেন, তাঁহার প্রত্যেক প্রকারের সৌন্দর্য্যের আলোচনায় যে ধর্ম্মপ্রবৃত্তি কোন প্রকারে বিশেষ বিকশিত হয়, তাহা সকলে স্বীকার করিবেন কি?

(২) যদি সৌন্দর্য্যের আলোচনাতে ধর্ম্মপ্রবৃত্তি বিকশিত হইবার সম্ভাবনাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি উপন্যাসের একটী লক্ষ্য বলিয়াই ধরিতে পারি। কারণ উপন্যাস দ্বারা ধর্ম্মপ্রবৃত্তি বিকাশের অন্য উপায়ও আছে। যেমন, মানব-জীবনের সমস্যা ব্যাখা। ইহাকে উপন্যাসের বিষয় বলিতে কুণ্ঠিত হই কেন?

তবে যদি ইহারা বলেন, ধর্ম্মপ্রবৃত্তি বিকাশ উপন্যাসের লক্ষ্য বটে, কিন্তু মূল লক্ষ্য চিত্তরঞ্জন; তবে সহজেই তাঁহাদিগকে প্রতীচ্য মতাবলম্বিগণের সহিত মিশাইয়া রাখিয়া আমরা নিরস্ত থাকিতে পারি।

বঙ্কিম বাবুর দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরের উপন্যাস।

এই দুই শ্রেণীর উপন্যাসের মূল উদ্দেশ্যে কোন বিভিন্নতা নাই। মানবজীবনের কঠিন সমস্যা ব্যাখ্যা উভয় স্তরের উপন্যাসেরই লক্ষ্য। তবে দ্বিতীয় স্তরের উপন্যাসে সে সমস্যা যত স্থূল, যত সাধারণ—তৃতীয় স্তরের সমস্যা সেরূপ নহে। ধর্ম্মপথে যাঁহারা একটু অগ্রসর, তৃতীয় স্তরের উপন্যাস তাঁহাদিগেরই উপযোগী। এখনও এই স্তরের উপন্যাস বঙ্গীয় পাঠকের উপযোগী হয় নাই—মহাকবি চিরদিনই পাঠকের বহু অগ্রে চলিয়া থাকেন।

যদি প্রতীচ্য মতানুযায়ী চিত্তরঞ্জন ক্ষমতা দ্বারাই উপন্যাসের বিচার করিতে হয়, তাহা হইলেও এই দুই স্তরের উপন্যাসকে শ্রেষ্ঠাসন দিতে আপত্তি করা যায় না। দ্বিতীয় স্তরের উপন্যাসে লক্ষ্য থাকিলেও, প্রতীচ্যমতাবলম্বী সমালোচকগণও এই শ্রেণীর উপন্যাসের প্রশংসা করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহারাই আবার বলিয়া থাকেন, উপন্যাসের চিত্তরঞ্জন ভিন্ন অন্য উদ্দেশ্য থাকিলে ভাল কাব্য-কৌশল প্রকাশিত হইতে পারে না। উপন্যাসের উদ্দেশ্য থাকিলেও যে তাহাতে কাব্যকৌশল থাকিতে পারে, বঙ্কিম বাবুর দ্বিতীয় স্তরের উপন্যাসগুলিই তাহার অখণ্ড প্রমাণ। ইহাতে যে Art বা কাব্যকৌশল সুপ্রকাশিত আছে, তাহা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন—আর উহার উদ্দেশ্য যে মানবজীবনের সমস্যা-ব্যাখ্যা তাহাও সকলেই স্বীকার করিতে পারেন।

উপন্যাসের উদ্দেশ্য থাকিলেই যে তাহা কাব্যকৌশলবিরহিত হইবে, একথা কিছুতেই বলা যায় না। তবে এ কথা বলা যায় যে, উপন্যাসে যে পরিমাণে উদ্দেশ্য থাকিবে, তাহাতে কাব্যকৌশল প্রদর্শন করিতে সেই পরিমাণে কষ্ট হইবে। সাধারণ পাঠক-সমীপে দ্বিতীয় স্তরের উপন্যাসে Art প্রকাশ করা যতটা সহজ, তৃতীয় স্তরের উপন্যাসে Art দেখান ততটা সহজ নহে। ইহার অনেক কারণ আছে। তন্মধ্যে দুইটি উল্লেখযোগ্য।

(১) দ্বিতীয় স্তরের উপন্যাস অপেক্ষা তৃতীয় স্তরের উপন্যাসের বিষয় উচ্চ—উচ্চ বিষয়ে Art প্রকাশ করা নীচ বিষয়ে প্রকাশ করা অপেক্ষা কষ্টকর। যেমন একটা সরল রেখা অঙ্কনকারী যেমন সহজে সরল রেখাটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়া তাহাতে বাহাদুরী নিতে পারে, একটি প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কনকারী তত সহজে সে বাহাদুরী নিতে পারে না। হয় ত যে সরল রেখা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিতে পারিল, সে প্রতিমূর্ত্তি আদৌ অঙ্কিতই করিতে পারিবে না। তুলনায় Art বিচারে বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিতেই হইবে।

(২) দ্বিতীয় স্তরের উপন্যাসের বিষয় প্রেমসমস্যা। এই প্রেম বা কাম, বা প্রেম-কাম বা এমনই একটা কিছু, সকলের হৃদয়েই স্বতঃ খেলিয়া থাকে। সকলের হৃদয়-তন্ত্রীতেই এ সুর বাজিয়া থাকে। সুতরাং লেখক

অতি সামান্য চেষ্টাতেই এই হৃদয়-তন্ত্রীতে আঘাত করিতে পারেন, এবং এইটী স্পর্শ-মাত্র স্বতঃ-নিনাদিত ধ্বনিতে তিনি সকলকেই মুগ্ধ করিতে পারেন। পুরুষ ও স্ত্রীর যে সম্বন্ধ লইয়া এই সকল সমস্যা বিরত হইয়াছে, সেই সম্বন্ধ পাঠককে বুঝাইতে অধিক প্রয়াস পাইতে হয় না। যাঁহারা সেই সম্বন্ধ জ্ঞাত আছেন, তাঁহারা গ্রন্থকারের উপন্যাসে তাঁহাদিগের চিত্ত প্রতিফলিত দেখিয়া আনন্দলাভ করেন এবং তজ্জন্য গ্রন্থকারের Art প্রশংসা করেন—আর যাঁহারা সে সম্বন্ধে তত অভিজ্ঞ নহেন, তাঁহারা গ্রন্থকারের হৃদয়-জ্ঞান দেখিয়া সহজেই তাহাতে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারিয়া বিস্মিত হইয়া থাকেন ও তাঁহার (Art) প্রশংসা করেন। ফলতঃ এ গুণ (Subject) বিষয়েরই বেশী। কিন্তু বঙ্কিম বাবুর তৃতীয় স্তরের উপন্যাসের বিষয় এমনই কঠিন যে, তাহা সকল পাঠকের হৃদয় পর্য্যন্ত প্রবেশ করাইতে গ্রন্থকার সমর্থ হয়েন না। সুতরাং পাঠক গ্রন্থকারের (Art) শিল্পের প্রশংসা করিতে পারেন না। যাঁহাদিগের হৃদয়ে এ সুর প্রবেশ করিতে পারে, তাঁহাদিগেরও অধিকাংশ হৃদয়-যন্ত্রের সুরের সহিত ইহা মিলাইতে না পারিয়া—গ্রন্থকারের (Art) শিল্পের প্রশংসা করেন না। যেমন উচ্চ বিষয়, তেমনই উচ্চ শ্রেণীর পাঠক চাই—নতুবা গ্রন্থের (Art) শিল্প অন্য বুঝিবে কেন? অত্যন্ত সূক্ষ্ম কারুকার্য্য স্থূলবুদ্ধি লোকের নিকটে প্রকাশিত হয় না—কারণ তাহারা সে (Art) বুঝিতে পারে না।

আমরা অবশ্য এমন কথা বলিতেছি না যে, এই তৃতীয় স্তরের উপন্যাসে বঙ্কিম বাবুর (Art) খুব খেলিয়াছে; পাঠকবর্গ বোকা দেখিয়া তাহা বুঝিতে পারিতেছেন না। আমরা এইমাত্র বলিতেছি যে, সাধারণ পাঠক এ (Art) সম্বন্ধে সুবিচারক নহে। কারণ (Art) ভাল খেলিয়া থাকিলেও সাধারণ পাঠকের তাহা না বুঝিবারই সম্ভাবনা বেশী। আর তৃতীয় স্তরের উপন্যাসে গ্রন্থকারের Artও তেমন না খুলিতে পারে, কারণ বিষয় বড় উচ্চ; ইহাতে Art প্রকাশ করা কঠিন। পাঠকবর্গ একবার এই সকল কথা ভাবিয়া মহা কবির এই তৃতীয় স্তরের উপন্যাসগুলির দোষ-গুণ পর্য্যালোচনা করিবেন। *

* আমরা এই তৃতীয় স্তরের উপন্যাস পাঠ করিয়া গ্রন্থকারকে লিখিয়াছিলাম "আপনার এই শেষ উপন্যাসগুলি পাঠ করিলে প্রথমের উপন্যাসগুলি বড়ই তরল-প্রকৃতির বলিয়া বোধ হয়"। এই কথার উত্তরে গ্রন্থকার আমাদিগকে লিখিয়াছিলেন—"এ সম্বন্ধে তোমার যে মত, অনেকেরই সেই মত।"

দৃষ্টিমূলক (Real) ও কল্পনামূলক (Ideal) উপন্যাস।

কোন একটী দিগন্তবিস্তৃত দৃশ্য দেখাইয়া দুইটি চিত্রকরকে বলা হইল, "তোমরা ইহা দেখিয়া দুইটি চিত্র প্রস্তুত কর।" চিত্রকর দুইটি, দুইটি চিত্র প্রস্তুত করিয়া আপনাদিগের সম্মুখে ধরিল।

প্রথম চিত্রকর যে পটখানি অঙ্কিত করিল, তাহা সেই বিশাল দৃশ্যস্থিত স্থানবিশেষের অবিকল প্রতিকৃতি হইল, বা তাহাতে সেই বিশাল দৃশ্যস্থিত কতকগুলি সৌন্দর্য্যের একত্র সমাবেশ চিত্রিত হইল। সে ঠিক সেই তেমনই মানুষ, তেমনই পর্ব্বত, তেমনই বৃক্ষ, তেমনই লতা আঁকিল —ঠিক সেই তেমনই সাগর, তেমনই উর্ম্মি তেমনই কানন, তেমনই প্রান্তর আঁকিল। এক চুলও এধার ওধার করিল না। যাহা সে দেখিতে পাইল, তাহা সে ঠিক্ তেমনই করিয়া আঁকিল। সে চিত্র দেখিয়া আপনারা মুগ্ধ হইলেন—কিন্তু তাহাতে এই বিশাল দৃশ্যস্থিত সৌন্দর্য্য ব্যতীত অপর কোন সৌন্দর্য্য আপনারা দেখিতে পাইলেন না, বা আনন্দ ভিন্ন আপনাদিগের আর কিছুই লাভ হইল না।

দ্বিতীয় চিত্রকর যখন তাহার চিত্রপটখানি প্রদর্শন করিল, আপনারা দেখিলেন, সে চিত্রপট খানির অবিকল সাদৃশ্য আপনার সেই বিশাল দৃশ্যের কোথাও নাই। চিত্রকর এ স্থানের একটা গাছ, ওখানের প্রান্তরে রোপণ করিয়াছে, ওখানের একটা নদী এখানে বহাইয়া দিয়াছে। অথচ এমনই সে চিত্রপটের সৌন্দর্য্য হইয়াছে যে, প্রকৃত দৃশ্যেও আপনার সে সৌন্দর্য্যের সমাবেশ নাই। চিত্রকর যেখানে যাহা দেখিয়াছে, সেখানে অবশ্য যাহা যেরূপ ছিল, তাহাই মূলে গ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু সে যাহা করিয়াছে তাহা দৃশ্যমধ্যস্থ কোন পদার্থেরই তুল্য নহে। সে এক অপূর্ব্ব চিত্র! কেবলমাত্র দেখিতে সেই চিত্র অপূর্ব্ব হইল এমন নহে, তাহা এমন হইল যে তাহা দেখিয়া প্রকৃত দৃশ্যস্থিত কোন্ সৌন্দর্য্যের কি কলঙ্ক আছে, তাহা আপনারা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিলেন—কোন্ গাছ্‌টিকে কিরূপ যত্ন করিলে আপনি তাহার সৌন্দর্য্য পূর্ব্বাধিক শত গুণে বাড়াইতে পারেন, তাহাও বুঝিতে পারিলেন। কুসুমে কীট প্রবেশ করিয়া কিরূপে তাহাকে নষ্ট করে—নদীতে কুম্ভীর কোথায় থাকে, রত্নই বা কোথায় থাকে—এ সকল অনায়াসে আপনারা বুঝিতে পারিলেন।

এখন বলুন দেখি পাঠক, আপনারা কোন্ চিত্রকরের প্রশংসা করিবেন—কোন্ চিত্রের প্রশংসা করিবেন?

এই প্রথম চিত্রকর ও দ্বিতীয় চিত্রকরে যে প্রভেদ—Real ও Ideal উপন্যাসকারেও সেই প্রভেদ। এই দুই চিত্রে যে প্রভেদ Real ও Ideal উপন্যাসেও সেই প্রভেদ।

জগতের অসংখ্য নরনারীচরিত্র উভয়

প্রকারের উপন্যাসেরই বিষয়। এক উপন্যাসকার সেই নরনারীচরিত্র হইতে কয়েকটি বাছিয়া ঠিক তাহারই প্রতিমূর্ত্তি তাঁহার উপন্যাসে চিত্র করেন। অপর উপন্যাসকার সেই নরনারীচরিত্র হইতে বাছিয়া বাছিয়া কয়েক প্রকার নরনারী-চরিত্র মূলতঃ অবলম্বন করিয়া, মানব-জীবনের কঠিন কঠিন সমস্যা ব্যাখ্যা দ্বারা লোকশিক্ষার্থ সেইগুলি তাঁহার উপন্যাসে চিত্র করিয়া দেখাইয়া থাকেন।

আমরা আর বলিব না—ইহাদের মধ্যে কে অধিকতর শিল্পী—কে অধিক-তর শ্রদ্ধার পাত্র—কোন্ চিত্র সুন্দর, কোন্ চিত্র উন্নতি-বিধায়ক ? সে বিচার আপনারাই করিয়া লইবেন। আমরা অতি সংক্ষেপে আমাদের বক্তব্য বলিলাম।

বঙ্কিম বাবুর উপন্যাসের অস্বাভাবিকতা।

বঙ্কিম বাবুর উপন্যাসের চরিত্র অস্বা-ভাবিক এই কথা অনেকের মুখেই শুনিতে পাই। ইঁহাদিগের দুই এক জনের নিকটে আমরা যাহা শুনিয়াছি, তাহাতে 'অস্বাভাবিক' কথাটা তাঁহার "অসামাজিক" অর্থেই ব্যবহার করিয়া থাকেন, এইরূপ বোধ হয়। দুই একটা উদাহরণ দিতেছি।

কেহ কেহ বলেন সূর্য্যমুখী হিন্দুঘরের স্ত্রীলোক, তাঁহার কি ঐরূপে একাকী ঘরের বাহির হইয়া যাওয়া স্বাভাবিক হইয়াছে ?

পাঠকগণ সহজেই বুঝিতে পারেন, আমরা যাহাকে অস্বাভাবিক বা অনৈ-সর্গিক বলি, ইহাতে তাহার কিছু দেখা যাইতেছে না ; তবে ইহাকে সমাজ-বিরুদ্ধ কার্য্য বা অসামাজিক কার্য্য বলা যায় বটে।

কেহ কেহ বলেন—শান্তি প্রকৃতির অন্য পুরুষের সঙ্গে ঐরূপ কথোপকথন অস্বাভাবিক। এখানেও পাঠকগণ দেখি-বেন, ইহাও প্রকৃত প্রস্তাবে অস্বা-ভাবিক নহে। হিন্দুরমণী সচরাচর এরূপ করিয়া থাকে না বটে—কিন্তু রমণীতে যে এরূপ করিতে পারে তাহা সকলেই দেখিতেছেন—অতএব এ দোষটাও অস্বাভাবিকতা নহে—অসামাজিকতা।

এই ঠিক সমাজের অনুরূপ চিত্র অঙ্কন করা কবির অভিপ্রেত ছিল না ; তিনি তাহা বিশেষ আবশ্যকও জ্ঞান করেন নাই। তিনি যে উদ্দেশ্য সাধনার্থ উপ-ন্যাস লিখিয়াছেন, সে উদ্দেশ্য সমাজ বিশেষের উপকার নহে। সকল জাতির —সমস্ত লোকের যাহাতে উপকার হইতে পারে, তাহাই তিনি করিতে চেষ্টা করিয়া-ছেন। তাহাতে যদি সমাজ-বিশেষের কোন চরিত্র, সমাজ-বিরোধী কোন কার্য্য করিয়া থাকে, সে দোষ পাঠকগণের ধরা উচিত নহে। হাঁ, যদি এই দোষ জন্য তাঁহার উদ্দেশ্য সাধনে কোন বিঘ্ন হইয়া

থাকে, তবে অবশ্য এ দোষ উপেক্ষার বিষয় নহে। নতুবা এ দোষ চন্দ্রের কলঙ্ক স্বরূপ। অনেকস্থলেই শোভারই বৃদ্ধি করিয়াছে।

সূর্য্যমুখী ঘরের বাহির হইয়া গিয়াছিল বলিয়া তাহার দ্বারা গ্রন্থকার যে উদ্দেশ্য সাধন করিতে চাহিয়াছেন, তাহার কণা মাত্রও বিফল হয় নাই। এ সকল সামান্য ব্যাপার মাত্র, মূলে ইহাতে কোন ক্ষতি হয় না।

এ সম্বন্ধে আর একটা কথা পাঠকবর্গকে না বলিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। একদিন বঙ্গের কোন সুপ্রসিদ্ধ কবি কথোপকথন-প্রসঙ্গে আমাদিগকে বলেন, "আচ্ছা মহাশয়, আপনারা শান্তিকে প্রশংসা করিতেছেন, শান্তির ন্যায় আপনাদিগের স্ত্রী যদি ঐরূপ বনে জঙ্গলে বাহির হইয়া ঐরূপ পুরুষের সহিত মিশে আপনারা তাঁহাকে পছন্দ করেন?" আমরা এ কথার উত্তরে বলিয়াছিলাম—"যদি আমাদিগের সহধর্ম্মিণীর অন্য সকল গুণ শান্তির মত হয়, তবে সে শান্তির চেয়ে আরো বেশী পুরুষের সঙ্গে মিলিলেও আমরা তাঁহাকে হৃদয়ে গ্রহণ করিয়া আপনাকে পুণ্যবান করি।"

ফল কথাও এই যে, সকল জড়াইয়া দেখিলে, এ সকল সামান্য ব্যাপারের উল্লেখই অকর্ত্তব্য। গ্রন্থকার অবশ্য আবশ্যক বোধ করিলে এ সকল দোষ সহজেই দূর করিতে পারিতেন। কিন্তু কোন স্থলে তিনি ইহার দোষ উপেক্ষাই করিয়া গিয়াছেন—কোন কোন স্থলে এই আপাতদৃষ্ট দোষ স্বীকার করিয়া তিনি তাঁহার উদ্দেশ্য সাধনে বেশী কৃতকার্য্য হইয়াছেন। শৈবলিনীর উচ্ছৃঙ্খলতা তাহার ফষ্টরের সঙ্গে যাওয়াতে যতটা খুলিয়াছে, সহজে অন্য ব্যাপারে ততটা খুলিত না।

যাহা অস্বাভাবিক তাহার নিন্দা কর, কিন্তু যাহা সমাজবিশেষের বিরোধী, তাহার নিন্দা করিবে কেন? কবি ত সমাজের ফটো তোমাকে দিতে প্রতিশ্রুত হইয়া কলম ধরেন নাই—তাহা যাঁহারা ধরিয়াছেন, সেই Real উপন্যাস লেখকগণের উপন্যাসে এ সকল দোষ-গুণ আলোচনা কর। তিনি যে উদ্দেশ্যে যাহা করিয়া গিয়াছেন, সেই উদ্দেশ্য ধরিয়া তাঁহার সেই কার্য্য বিচার করাই নিরপেক্ষ সমালোচকের কার্য্য। কোন সমাজের চিত্র সেই সমাজবিরোধী বেশে উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া কি, সেই চিত্র কম ফলদায়ক Impressive হইয়াছে? যেখানে সেইরূপ দেখিতে পাইবে সেখানে তাঁহার Art নিন্দা করিও, কিন্তু উপন্যাসের স্বাভাবিকতার বা সামাজিকতার সঙ্গে তাঁহার উপন্যাসের স্বাভাবিকতা ও সামাজিকতা তুলনা করিয়া তাঁহার উপন্যাসের সমালোচনা করিও না। Real উপন্যাস-লেখক সামান্য চিত্রকর মাত্র—আমাদের মহাকবি আমাদিগের গুরু স্বরূপ। তিনি চিত্র দেখাইয়া ছেলে ভুলাইতে চাহেন নাই—তিনি চিত্রপ্রদর্শনে আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির চেষ্টা করিয়াছেন।

বঙ্কিম বাবুর উপন্যাসের স্ত্রীচরিত্র।

তিলোত্তমা, মৃণালিনী, কপালকুণ্ডলা, কুন্দনন্দিনী, রজনী, দলন ও রমা—অল্পাধিক চরিত্রের মৃদুতাই ইহাদিগের বিশেষ বিশেষত্ব। এই চরিত্রের মৃদুতার সহিত কমনীয় প্রেমবৃত্তির অপূর্ব্ব সংমিশ্রণেই ইহারা গঠিত হইয়াছেন। ঠিক "চাঁদের আঁচলে নবনীত ছাকিয়া"ই যেন কবি ইহাদিগকে গঠন করিয়াছেন। এই সকল চরিত্রের অপর একটী বিশেষত্ব সংসারানভিজ্ঞতা। তিলোত্তমা হইতে রমা পর্য্যন্ত সকলেই সংসার-শাস্ত্রে অনভিজ্ঞা। কপালকুণ্ডলার ত কথাই নাই। বোধ হয় ইহাও চরিত্রের মৃদুতা হইতে উৎপন্ন। এই অল্পভাষিণী—কুসুম-কমনীয়া—সংসার-শাস্ত্রে অনভিজ্ঞা রমণীগণ বঙ্কিম বাবুর প্রথম স্তরের স্ত্রীচরিত্র।

এই কয়েকটি চরিত্রের একভাবে বিপরীত চরিত্র—বিমলা ও কমলমণি। যেমন তিলোত্তমাদিতে চরিত্রের মৃদুতা, বাক্যবিহীনতা, সংসারশাস্ত্রে অনভিজ্ঞতা দেখিতে পাই, এই দুইটি চরিত্রে তেমনই চরিত্রের প্রখরতা, বাক্যের প্রগল্‌ভতা ও সংসার-শাস্ত্রে অভিজ্ঞতা দেখিতে পাই। ফলতঃ নারীচরিত্র বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে এই দ্বিবিধ চরিত্র প্রতিই আমাদিগের দৃষ্টি পতিত হয়। আমরা ভালবাসিবার জন্য, সমান আসন প্রদান করিয়া বন্ধুত্ব স্থাপন জন্য, বিমলা ও কমলমণিকে চাহি—কিন্তু স্নেহ করিবার জন্য, কল্পনাময়ী প্রবৃত্তির সহচারিণী করিবার জন্য তিলোত্তমাদি রমণীই পছন্দ করিয়া থাকি। এই দুই শ্রেণীর স্ত্রীচরিত্রোপরি যুবক কবির দৃষ্টি সম্পূর্ণই স্বাভাবিক।

তিলোত্তমাদি হইতে বিমলা ও কমলমণি আর দুই একটি বিষয়েও বড় বিভিন্ন। তিলোত্তমাদির প্রেম যেমন বন্যার নদীজলের মত উদ্বেলিত ও তরঙ্গায়িত, এই বিমলা ও কমলমণির প্রেম তেমন উদ্বেলিত নহে, কিন্তু তবু পরিপূর্ণ। একে আকাঙ্ক্ষার অতৃপ্তি আছে—অন্যে ভোগের তৃপ্তি আছে। আবার তিলোত্তমাদি যেমন আপনা লইয়াই ব্যস্ত—আপনার প্রেমসাগরেই আপনি মগ্ন, বিমলা ও কমলমণি তেমন নহে। তাঁহারা ঠিক ইহার বিপরীত। বিমলা ও কমলমণি পরের জন্যই বেশী ফুটিয়াছেন। এ কথা অন্যত্র বিস্তৃত বলিয়াছি।

গ্রন্থকার তিলোত্তমাদি চরিত্রে প্রেমের উচ্ছ্বাস দেখাইয়াছেন, এবং তাহার স্থির, ধীর তৃপ্তিও দেখাইয়াছেন। বিমলাদি চরিত্রেও প্রণয়ের ধীর, স্থির অথচ পরিপূর্ণ ভাব প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে তাহার প্রণয় সম্বন্ধীয় সকল দিক দেখান হইল না। তাই আয়েসা সাহিত্য-ক্ষেত্রে অবতীর্ণা হইলেন। ইনি নিরাশ-প্রণয়ী। তিলোত্তমাদি সকলেই যেমন ভালবাসিয়াছেন, তেমনই ভালবাসা পাইয়াছেন, এই আয়েসা তাহার বিপরীত চিত্র। ইনি যেমন ভালবাসিয়াছেন, তেমন ভালবাসা পাইতে পারেন নাই। প্রণয়ের এই দিক্‌টা দেখাইবার জন্য আয়েসার সৃষ্টি হইল।

কিন্তু আয়েষা-সৃষ্টি করিয়াও কবি প্রণয়ের এ ভাগটা শেষ করিতে পারিলেন না। আয়েষা জগৎসিংহকে ভালবাসিতেন, জগৎ সিংহ আয়েষাকে তেমন ভালবাসিতেন না—জগৎ সিংহ তিলোত্তমাতে অনুরক্ত, তাহাকেই বিবাহ করিলেন—এ অবস্থায় রমণীর চিত্র যেমন হইতে পারে, আয়েষা তেমনই হইল। কিন্তু নিরাশ প্রণয়ের আর একটা ভাব দেখাইতে বাকী রহিল। যে ক্ষেত্রে নায়ক-নায়িকা পরস্পর অনুরক্ত, অথচ ঘটনা-বিশেষে বা সামাজিক নিয়মবশে তাহাদের সে প্রণয়ের পরিতৃপ্তি (মিলনকেই পরিতৃপ্তি বলিলাম) হইতে পারে না, সে স্থলে কিরূপ হয়, তাহাই দেখাইবার জন্য শৈবলিনী ও লবঙ্গলতা কল্পিত হইল। দুইয়েরই মনের অবস্থা প্রায় তুল্য, তবে একে প্রণয়ের উচ্ছ্বাস সংবরণ করিতে না পারিয়া, প্রণয়ীর অভিমুখে প্রধাবিত হইল—অপরে প্রেমোচ্ছ্বাস শিক্ষাবলে সংযত করিয়া তাহাকে বিন্দু হইতেও বিন্দুতে পরিণত করিয়া সভয়ে হৃদয়ের অতি নিভৃত স্থানে এক কোণে রাখিয়া দিল। উভয়েরই অগ্নিপরীক্ষা করাইয়া কবি দেখাইয়াছেন; একে ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে—অপরে অগ্নিদগ্ধ সুবর্ণের ন্যায় পূর্ব্বাপেক্ষা সহস্রগুণে উজ্জ্বলতর হইয়া চতুর্দ্দিকে দীপ্তি প্রকাশ করিয়াছে।

আবার এই আয়েষা ও লবঙ্গলতার মধ্যবর্ত্তী চরিত্র (যে ভাবের সম্বন্ধে বলিতেছি অবশ্য সেই ভাবে) এই মনোরমা। মনোরমা আয়েষাও নহে, শৈবলিনী বা লবঙ্গলতাও নহে। অথচ তাহার প্রণয় ইহাদিগেরই ন্যায় লুক্কায়িত। যেমন তিলোত্তমাদির মধ্যে কপালকুণ্ডলার বিশেষ বিশেষত্ব আছে, তেমনি এই গুপ্তপ্রণয়িনী-শ্রেণী মধ্যে মনোরমাতে কিছু বিশেষত্ব আছে। এ কথা অন্যত্র খুলিয়া বলিয়াছি, এখন এই সম্বন্ধ মাত্র দেখাইয়াই ক্ষান্ত হইব।

এই সকল দেখিতে দেখিতে প্রণয়ের আরও একটা ভাবের প্রতি কবির দৃষ্টি পড়িল। সে ভাবটী নীচজাতীয়া স্ত্রীলোকেই দেখিতে পাওয়া যায়—কিন্তু কবি তাহাও দেখাইয়াছেন, পদ্মাবতী ও আরঙ্গজেবের কন্যা এই চরিত্রদ্বয়ে। ইহারা বড় ঘরের হইয়াও বারাঙ্গনা ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। এই বারাঙ্গনার প্রণয়বিকৃতিই এই চরিত্রদ্বয়ের এক প্রকার লক্ষ্য। রুচি যাহাই থাকুক, এই শ্রেণীর স্ত্রীচরিত্রেও প্রণয় পাত্রবিশেষে কিরূপে প্রবেশ করে, কিরূপে আধিপত্য করে, এই দুইটি স্ত্রীচরিত্র তাহাই দেখাইয়াছে। তিলোত্তমাদির পরে যেমন আয়েষার কল্পনা, আয়েষার কল্পনার পরে যেমন মনোরমার কল্পনা, মনোরমার কল্পনার পরে যেমন লবঙ্গলতা ও শৈবলিনীর কল্পনা, তেমনই শৈবলিনীর কল্পনার পরে এই পদ্মাবতী প্রভৃতির কল্পনা স্বাভাবিক। ফলতঃ প্রণয়ের কোন অংশই গ্রন্থকার দেখাইতে বাকী রাখেন নাই।

এই সকল চরিত্রই আমরা গ্রন্থকারের প্রথম স্তরের স্ত্রীচরিত্র বলিব। পাঠকগণ মনে রাখিবেন, প্রথম স্তরের স্ত্রীচরিত্রে ও প্রথম স্তরের উপন্যাসের স্ত্রীচরিত্রে প্রভেদ থাকিতে পারে। সে কথা পরে বলিতেছি।

এই সকল স্ত্রীচরিত্রের পরে আর এক স্তরের স্ত্রীচরিত্র গঠিত হইল। এই স্তরের

স্ত্রীচরিত্রে প্রণয়ের সেই বিস্তৃত রহস্য বিবৃত হইল।

সূর্য্যমুখী, ভ্রমর, এই দুইটি চরিত্রই এই স্তরের প্রধান চরিত্র।

স্বামী-স্ত্রীর প্রণয়-রহস্য এই চিত্র দুইটিতে প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রধানতঃ স্বামী ব্যভিচাররত হইলে, স্ত্রীর কোন্ প্রকার ব্যবহারে কোন্ ফল হইয়া থাকে, তাহাই এই চরিত্রদ্বয় পাঠে অবগত হইলাম। তাহাই শিক্ষা দেওয়া এই চরিত্রদ্বয়ের মুখ্য উদ্দেশ্য বটে।

আর একদিক হইতেও দেখুন, আর একটা সম্বন্ধ বাহির হইতেছে। পূর্ব্বে আমরা নায়ক-নায়িকার বিঘ্নবহুল অথচ মিলনযুক্ত প্রণয়ের উচ্ছ্বাসের ভাব ও স্থিরভাব দেখিয়াছি, পূর্ব্বে আমরা নায়ক-নায়িকার মিলনাবস্থার স্থির ভাব ও ধীর প্রেমস্রোতও দেখিয়াছি ; পূর্ব্বে আমরা নায়ক-নায়িকার মিলনাশারহিত, উচ্ছ্বসিত গুপ্ত প্রণয়ের ভাবও দেখিয়াছি—এখন বাকী আছে, আর একটী ভাব দেখিতে। এ পর্য্যন্ত যে প্রণয় দেখিয়াছি, তাহা প্রায় একটানা—এই প্রণয়ের স্রোত এই সকল চরিত্রে এক দিকেই প্রায় বহিয়াছে। কিন্তু প্রণয়ের স্রোত ফিরিলে, প্রণয়সাগরে জোয়ার ভাঁটা খেলিলে কিরূপ হয়, তাহা আমরা দেখি নাই। কবি তাহাই দেখাইবার জন্য আর এক শ্রেণীর স্ত্রীচরিত্র অঙ্কিত করিলেন ; তাঁহাদের নায়কের প্রণয়ে এই জোয়ার ভাঁটা খেলিয়াছে। নায়িকার প্রণয়ে জোয়ার ভাঁটা দেখাইতে গেলে, তাহা বেশ্যার চিত্র হইয়া পড়ে, সে বেশ্যার চিত্রও পদ্মাবতী প্রভৃতিতে দেখিয়াছি। এখন নায়কের প্রণয়ের স্রোত ফিরিলে, কিরূপ ঘটিয়া থাকে তাহা দেখিতে পাইলাম। এ হিসাবেও সূর্য্যমুখী ও ভ্রমর পূর্ব্বোক্ত চরিত্রগুলি হইতে পৃথক স্তরের বটে।

নন্দা কলঙ্কশূন্যা সূর্য্যমুখী ; সাগর দুরদৃষ্টবিরহিতা ভ্রমর।

এখন তৃতীয় স্তরের স্ত্রীচরিত্র সম্বন্ধে আমাদিগের বক্তব্য বলিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব।

ভগবানের সৃষ্টি রহস্যের মধ্যে জীবগণের পুং-স্ত্রীবিভাগ অতি অদ্ভুত রহস্য। ভাবিয়া দেখিলে এই অপূর্ব্ব রহস্য মধ্যেই সমস্ত জীবসৃষ্টিরহস্য লুক্কায়িত রহিয়াছে। জীব সৃষ্টির মধ্যে আবার মানব-সৃষ্টিই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক রহস্যময়। সেই মানব সৃষ্টির মধ্যে রমণী-পুরুষের সম্বন্ধ বুঝি জগতের রহস্যের মধ্যেও রহস্য। মানব-রাজ্যটিই যেন এই অপূর্ব্ব রহস্যে কেন্দ্রীভূত। ঐ যে দিগন্তব্যাপী সংসারচক্র মহান্ কোলাহল করিয়া দিবানিশি অবিশ্রান্ত বিঘূর্ণিত হইতেছে, স্ত্রীপুরুষের সম্বন্ধই ইহার প্রধান কারণ। যে বিবাহ হইতে এই সংসার—সেই বিবাহই এই অপূর্ব্ব সম্বন্ধের একটি অপূর্ব্ব সংযোজনা মাত্র। তত্ত্বদর্শী মনীষিগণ স্ত্রীপুরুষের এইরূপ নৈসর্গিক প্রবল আকর্ষণ দৃষ্টি করিয়া, ইহা হইতে ভগবানের অভিপ্রেত শুভফল উৎপাদন মানসে, বিবাহ-প্রথার প্রচলন করিলেন। ক্রমে মানব-সমাজে এই শুভ প্রথা বিস্তৃত হইয়া পড়িল। সমস্ত সভ্য জাতিই ইহার শুভফল ও আবশ্যকতা সম্বন্ধে একমত হইয়া পরিণয়-প্রথা প্রবর্ত্তিত করিলেন, স্বাভাবিক রহস্য সামাজিক রহস্যে পরিবৃত হইয়া আরও সুন্দর হইয়া দাঁড়াইল।

বিবাহ সম্বন্ধে মূলতঃ সকল জাতিই একমত হইল বটে, কিন্তু স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধ-বিচারে—পরস্পর কর্ত্তব্যবিচারে ইহার ঐহিক পারত্রিক ফল বিচারে, জাতিগত বিষম বৈলক্ষণ্যের সৃষ্টি হইল। একটু ভাবিয়া দেখিলে বোধ হয় যে, জীবনের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন মতই এই বৈষম্যের মূল কারণ। যাঁহারা মানবজীবনের কর্ত্তব্য সামান্য ইন্দ্রিয়াদি সুখ লাভের চেষ্টাতেই পর্য্যাপ্ত করিলেন—স্ত্রী তাঁহাদিগের নিকট হইল ইন্দ্রিয়সুখের উপকরণ, বিলাসের সামগ্রী। তাঁহাদের স্ত্রী পুরুষের সম্বন্ধ ঐহিক সুখকর বলিয়া ঐহিক হইয়াই পড়িল। তাঁহারা যত্ন করিয়া তাঁহাদের রমণীবৃন্দকে এই ঐহিক সুখবর্দ্ধনের ক্ষমতা পরিবৃদ্ধি করিতে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। আর যাঁহারা মানবের প্রকৃত সুখ লাভের অর্থাৎ ধর্ম্মানুগত সুখলাভের চেষ্টায় ধর্ম্মাচরণই জীবনের কর্ত্তব্য বলিয়া অবধারণ করিলেন—স্ত্রী হইল তাঁহাদের নিকট সহধর্ম্মিণী। তাঁহারা যত্নপূর্ব্বক স্ত্রীকে স্বামীর ধর্ম্মচর্য্যায় সহায়তা করিতেই শিক্ষা দিতে লাগিলেন। এইরূপ বিভিন্ন জাতিতে বিভিন্ন প্রকার স্ত্রীপুরুষের কর্ত্তব্য ও সম্বন্ধ নির্দ্ধারিত হইয়া পড়িল।

বলা বাহুল্য যে, হিন্দুজাতি স্ত্রীকে সহধর্ম্মিণী ভাবেই গ্রহণ করিলেন। হিন্দুপত্নীর সহিত হিন্দুপতির সম্বন্ধ ঐহিক হইতে পারত্রিকে উঠিল। হিন্দুরা হিন্দুপত্নীকে স্বামীর ধর্ম্মে সহায়তা করিতেই শিক্ষা দিতে লাগিলেন। ফলে এই হইল যে, হিন্দুপত্নী হিন্দুপতির ঐহিক, পারত্রিক, সামান্য ও বিশেষ উভয়বিধ সুখেরই উপাদান হইয়া পড়িলেন। হিন্দুপত্নী হিন্দুপতির যেমন প্রণয়িনী সুখ প্রদায়িনী,—তেমনই আবার সহধর্ম্মিণী ও ধর্ম্মশক্তিবিধায়িনী। অন্য জাতির পত্নী কি এরূপ নহে? তাহা নহে। মানব ইচ্ছা করিয়া স্ত্রী পুরুষের সম্বন্ধ যাহাই নির্দ্দিষ্ট করুক না কেন—ভগবানের অভিপ্রেত নৈসর্গিক সম্বন্ধ কোথায় যাইবে? হিন্দুজাতির ন্যায় অন্যান্য জাতিরও ধর্ম্মে, কর্ম্মে, সংসারে, সন্ন্যাসে স্ত্রী পুরুষের অপূর্ব্ব সম্বন্ধ অতি অদ্ভুত স্ফুরতাই প্রকাশ করে। তবে প্রভেদ এই যে, হিন্দুগণ ইহা জ্ঞান করিয়া বুঝিয়া স্ত্রীগণের শিক্ষাপ্রণালীটি অতি সুন্দর করিয়া তুলিয়াছেন—অন্য জাতি ইহা না বুঝিয়া তাঁহাদের রমণীবৃন্দের শিক্ষাপ্রণালী কিছু বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছেন। হিন্দু-পতি-পত্নীর ধর্ম্মই মূল লক্ষ্য—প্রণয়, সুখ, তাহার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম; অন্য জাতির স্বামী স্ত্রীর-প্রণয়-সুখই মূল লক্ষ্য, সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মটা যতটুকু আসিয়া পড়ে। অপক্ষপাত-চিত্তে বিচার করিয়া দেখিলে—মূলতঃ অনেকটা সাদৃশ্য থাকিলেও, ফলতঃ হিন্দুরাই কিছু ভাল বুঝিয়াছেন।

হিন্দুগণের স্ত্রী-পুরুষের এই অপূর্ব্ব সম্বন্ধই হিন্দুকবি বঙ্কিমচন্দ্রের কাব্যের একটি প্রধান বিষয়। সুতরাং তাঁহার স্ত্রীচরিত্রগুলি ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে, হিন্দু-পতি-পত্নীর সম্বন্ধটা ভাল করিয়া বুঝিতে হয়।

হিন্দুপত্নী হিন্দুপতির যেরূপ আনন্দদায়িনী প্রণয়িনী, সেইরূপই আবার কর্ম্মশক্তিবিধায়িনী সহধর্ম্মিণী। বঙ্কিম বাবুর উপন্যাসে হিন্দুপত্নীর এই দ্বিবিধ

ভাবই সুন্দর প্রদর্শিত হইয়াছে। ফলতঃ এইভাব অবলম্বন করিয়া কেবলমাত্র স্ত্রীচরিত্র দ্বারাও তাঁহার উপন্যাসের স্তর-বিভাগ প্রদর্শন করা যায়। তাঁহার প্রথম দুই স্তরের উপন্যাসে স্ত্রীর প্রণয়িনী-ভাবই মুখ্যরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। স্বামী স্ত্রীর এইরূপ প্রণয় কেমন সুন্দর, কেমন সুখদ, তাহা তিনি প্রথমে দেখাইয়া, সেই প্রণয়ের নানারূপ বিঘ্ন-বিপত্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। কিরূপে সামান্য কথায়—সামান্য আত্মসংযমের অভাবে—সামান্য সতর্কতা অভাবে, সে প্রণয়-সুখ ভাঙ্গিয়া যায়—তাহা তিনি প্রথম দুই স্তরের উপন্যাসে অতি জলন্ত ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন। তদ্দ্বারা মানবমনের প্রণয়বৃত্তির রহস্যটি অতি সুন্দররূপেই বিবৃত হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার শেষের স্তরের উপন্যাসে স্ত্রীচরিত্রের মুখ্যভাব প্রণয়িনী-ভাব নহে—সহধর্ম্মিণী ভাব। পূর্ব্বেই বলিয়াছি—এই শেষের ভাবের সঙ্গে প্রথম ভাব অবশ্যই জড়িত থাকিবে। তাই আনন্দমঠ—দেবীচৌধুরাণী—সীতারাম—এই উপন্যাসত্রয়ের প্রধান প্রধান স্ত্রীচরিত্রগুলি যেরূপ প্রণয়িনী সেইরূপই সহধর্ম্মিণী। এই উপন্যাসত্রয়ের স্থূল বিষয়ও যেরূপ উচ্চ, স্ত্রীচরিত্রের ভাবগুলিও তেমন উচ্চ। এই স্তরের উপন্যাসে তিনি দেখাইয়া গিয়াছেন—হিন্দুপত্নী কিরূপে হিন্দুপতির ধর্ম্মাচরণে সহায়তা করিতে পারে, কিরূপে সেই সহায়তা প্রাপ্ত হইলে হিন্দুপতি বিবিধ প্রলোভনে পড়িয়াও স্বীয় ধর্ম্ম অক্ষুণ্ণ ও বজায় রাখিতে পারে। আবার ইহাতেই তিনি দেখাইয়া গিয়াছেন—প্রকৃত সহধর্ম্মিণীর সাহায্য অভাবে লোকে কিরূপে ধর্ম্মপথস্খলিত ও লক্ষ্মীছাড়া হইয়া যায়—কিরূপে জিতেন্দ্রিয় ও সংযমী ব্যক্তিরও স্ত্রীর প্রতি অনুরাগ—প্রকৃত সহধর্ম্মিণী অভাবে—সামান্য কামজ প্রেমে পরিণত হইয়া যায়। তাঁহার এই শেষের স্তরের উপন্যাসের স্ত্রীচরিত্রের পাপগুলি অতি সূক্ষ্ম; সামান্য বুদ্ধিতে তাহা ধরিতে পারা যায় না। কিন্তু তবু সেই রকম সূক্ষ্ম পাপে কিরূপ স্থূল পতন আনয়ন করিতে পারে তাহা তিনি এই শেষের স্তরের উপন্যাসগুলিতে অতি সুন্দরই দেখাইয়া গিয়াছেন।

শান্তি, শ্রী, প্রফুল্ল, নিশা ও জয়ন্তী ইহারা এই তৃতীয় স্তরের স্ত্রীচরিত্র। এই চরিত্রগুলি মধ্যে কতকগুলি গৃহিণী কতকগুলি সন্ন্যাসিনী। কতকগুলি পতিযুক্তা—কতকগুলি পতিবিযুক্তা। গ্রন্থকার এই দুই শ্রেণীর রমণীর দুই প্রকার ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেখাইয়াছেন যে, এক শ্রেণীর ধর্ম্ম অপরের গ্রহণীয় নহে। সন্ন্যাস শ্রেষ্ঠধর্ম্ম হইলেও তাহাতে অধিকারিভেদ আছে। ইহা দেখাইবার জন্যই তিনি প্রফুল্ল ও শ্রী উভয় দ্বারা সন্ন্যাস আরম্ভ করাইয়া তাহার ফলাফল দেখাইয়াছেন। একজনকে তিনি সন্ন্যাস হইতে ফিরাইয়া আনিয়া নিষ্কাম গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করাইয়া চরিত্রের সাফল্য প্রদর্শন করিলেন—আমরা প্রফুল্ল চিত্তে প্রফুল্ল-চিত্রে শিক্ষার সুফলই দেখিলাম। অন্যটিকে সন্ন্যাসধর্ম্ম হইতে চ্যুত করাইয়া অর্দ্ধেক গৃহস্থভাবে আনাইয়া সেই অবলম্বিত পথের দোষভাব প্রদর্শন করিলেন—আমরা দুঃখিত চিত্তে স্ত্রীচরিত্রে সীতা-

রানের অধঃপতনেরই কারণ দেখিলাম। পক্ষান্তরে নিশা ও জয়ন্তীর চিত্রে সেই সন্ন্যাস-ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতাও প্রত্যক্ষ করিতে পাইলাম।

বঙ্কিমবাবুর উপন্যাসের পুরুষ-চরিত্র।

প্রথম স্তরের পুরুষ চরিত্রে আমরা যুবক জনের উচ্ছ্বসিত রমণী প্রেম দেখিতে পাই। গ্রন্থকার এই সকল চরিত্রের রমণী প্রেম বিশ্লেষণ করিয়া তাহাতে কোন আবিলতা থাকা প্রদর্শন করেন নাই। ফলতঃ সেই কামজ পদার্থটির সহিত এই প্রণয়ের অপরূপ সম্বন্ধ প্রতি তখন যেন গ্রন্থকারের বিশেষ দৃষ্টিই পতিত হয় নাই।

এই শ্রেণীর পুরুষচরিত্রগুলিকে পূর্ব্ব-বর্ণিত স্ত্রীচরিত্রের ন্যায় নিম্নোক্ত ভাগে বিভাগ করা যায়।

(১) যাঁহারা তাঁহাদিগের প্রণয়পাত্র সমীপে প্রতিদানে ভালবাসা পাইয়াছেন এবং সেই পাত্রের সহিত বিবাহ সম্বন্ধে মিলিত হইতে পারিয়াছেন।

যেমন, জগৎসিংহ, হেমচন্দ্র ; শচীন্দ্র-নাথ।

(২) যাঁহারা তাঁহাদিগের প্রণয়-পাত্র সমীপে প্রতিদানে ভালবাসা পাইয়াছেন বটে, কিন্তু বিবাহ-বন্ধনে মিলিত হইতে পারেন নাই।

যেমন, প্রতাপ, অমরনাথ, পশুপতি।*

(৩) যাহারা আদৌ প্রণয়-পাত্র হইতে প্রতিদানে সে প্রকার ভালবাসা প্রাপ্ত হয়েন নাই।

যেমন, চন্দ্রশেখর, নবকুমার।

দ্বিতীয় স্তরের পুরুষ চরিত্র সৃষ্টিকালে প্রেমের সহিত কামের অপূর্ব্ব সম্বন্ধের প্রতি কবির সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি পড়িল। তখন তিনি দেখিলেন, যাহা দীপ্তিমান্‌, তাহাই স্বর্ণ নহে। তখন তিনি কাম ও প্রেমের অপূর্ব্ব সংযোজন ও বিশ্লেষণ দেখাইতে প্রবৃত্ত হইলেন।

নগেন্দ্রনাথ, গোবিন্দলাল এই দুই স্তরের প্রধান চিত্র।

দ্বিতীয় স্তরের পুরুষ চরিত্র শেষ করিয়া কবি দেখিলেন, প্রেমে যে কেবলমাত্র কামই দূষিত তাহা নহে, ইহাতে অন্য দূষণীয় পদার্থও আছে। তিনি দেখিলেন যে, রমণীজাতির সহিত পুরুষের অপরূপ সম্বন্ধ বশতঃ এই রমণীর প্রেম, কামজ হউক কি না হউক, বিবাহিতা পত্নী প্রতিই হউক, কি অন্য স্ত্রী প্রতিই হউক, লোকের কর্ত্তব্যানুষ্ঠান-ক্ষমতার প্রতি বড়ই ক্রিয়া প্রকাশ করে। পুরুষের হৃদয়োপরি রমণী-প্রেমের এই অদ্ভুত আধিপত্য এই তৃতীয় স্তরের পুরুষ-চরিত্রের বর্ণিতব্য বিষয়।

জীবানন্দ, ভবানন্দ, ব্রজেশ্বর, সীতারাম, গঙ্গারাম প্রভৃতি এই শ্রেণীর চরিত্র।

এতদ্ভিন্ন আর এক শ্রেণীর পুরুষ চরিত্র

---

* পশুপতির বিবাহ হইয়া থাকিলেও মিলন হইতে পারে নাই।

আছে, তাঁহারা এই সকল উপন্যাসে রমণী-সম্বন্ধ পরিশূন্য।

অভিরামস্বামী, মাধবাচার্য্য, অধিকারী, চন্দ্রশেখরের গুরু, রজনীর সন্ন্যাসী, সত্যানন্দ, সত্যানন্দের গুরু, ভবানী পাঠক, চন্দ্রচূড়, এই স্তরের চরিত্র। ইহাদিগের সম্বন্ধে আমাদিগের বক্তব্য অন্যত্র বলিতেছি।

বঙ্কিম বাবুর উপন্যাসের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত।

ব্রাহ্মণ পণ্ডিত অনেক রকমের আছে, ভবানী পাঠকের এই কথাটা পাঠক একবার ভাবিয়া দেখুন। সেই দুর্গেশনন্দিনীর অভিরাম স্বামী, মৃণালিনীর মাধবাচার্য্য—কপালকুণ্ডলার অধিকারী, আনন্দমঠের সত্যানন্দ, দেবীচৌধুরাণীর ভবানী পাঠক, সীতারামের চন্দ্রচূড়—ইহাদিগকে স্মরণ করুন। তার পরে আমাদিগের যাহা বলিবার আছে, তাহা বলিতেছি!

ভারতবর্ষের ইতিহাস যিনিই পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন, তিনি ইহাতে একটা বিষয় দেখিয়া বিশেষ বিস্মিত হইবেন। সে বিষয়টি, ভারতবাসীর উপর ব্রাহ্মণের আধিপত্য। সেই গায়ে নামাবলি, কপালে ফোঁটা, মাথা কামান, দরিদ্র ব্রাহ্মণপণ্ডিতের আধিপত্য। দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ রাজা সেই ব্রাহ্মণের পদধূলি মস্তকে গ্রহণ করিতেন—সেই ব্রাহ্মণের বাক্যে রাজ্যধনজন পর্য্যন্ত নষ্ট করিতে প্রস্তুত থাকিতেন। বাহুবলে বলীয়ান্ ক্ষত্রিয়োপরি ধর্ম্মবলে বলীয়ান্ ব্রাহ্মণের আধিপত্য রহস্যের বিষয় বটে। কিন্তু মানুষের প্রকৃত বল কি—তাহা একবার পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে, এ রহস্য স্বতঃই ব্যাখ্যাত হইয়া পড়ে। শারীরিক বল যে মানুষের শ্রেষ্ঠ বল নহে, মানসিক বল বিদ্যাবুদ্ধিও যে মানুষের প্রকৃত বল নহে, তাহা এই ব্রাহ্মণপণ্ডিতের বল দেখিয়া বুঝিতে পারা যায়। এই ব্রাহ্মণকুল অবশ্য বিদ্বান ও বুদ্ধিমান ছিলেন, কিন্তু তাহাতেই কি তাঁহাদের এত বল জন্মিয়াছিল? তাহা নহে। তাঁহাদিগের প্রকৃত বল ছিল, ধর্ম্মবল; এবং এই ধর্ম্মবলই মানুষের সর্ব্বপ্রধান বল। এই বলেই ভারতের ব্রাহ্মণগণ—সেই স্বার্থত্যাগী পরোপকারব্রতে ব্রতী, সংসারে অনাসক্ত অথচ কর্ম্মবীর ব্রাহ্মণগণ ভারতবর্ষে এত প্রভাবশালী ছিলেন। যিনি শারীরিক বলের উপর নির্ভর করেন, সামান্য অস্থিমাংসনির্ম্মিত শরীর তাঁহার সহায়; যিনি বিদ্যাবুদ্ধির উপর নির্ভর করেন, তাঁহাদের সান্ত ও ভ্রমসম্ভাবনাযুক্ত বিদ্যাবুদ্ধিই একমাত্র সহায়; কিন্তু যাঁহারা ধর্ম্মের উপর নির্ভর করেন, অসীম, অনন্ত ক্ষমতাশালী ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরই তাঁহাদের সহায়। কাজেই ধর্ম্মবলের প্রভাব অসীম। এই ধর্ম্মবলই ভারতের প্রকৃত বল ছিল—এই ধর্ম্মবলহীনতাই ভারতের অধঃপতনের প্রধান কারণ। এই ব্রাহ্মণপণ্ডিতের উত্থান ও পতনে ভারতের উত্থান ও পতন হইয়াছে,

হইয়াছে এবং ভবিষ্যতেও হইবে। এ এ কথা নিশ্চিত। আমাদিগের সূক্ষ্মদর্শী অতুল প্রতিভাশালী কবি, ইহা জ্ঞানচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন—তাই তাঁহার গ্রন্থে দেশোদ্ধারের চেষ্টায় এই ব্রাহ্মণপণ্ডিতকেই ব্রতী দেখিতে পাই।

অভিরাম স্বামী মাধবাচার্য্য, অধিকারী, সত্যানন্দ, চন্দ্রচূড় ও ভবানী পাঠক—ইহাদিগের মধ্যে বিশেষ একটা সম্বন্ধ আছে যেমন গ্রন্থকারের ভালবাসা তত্ত্ব ক্রমে স্তরে স্তরে বিকশিত হইয়াছিল দেখাইয়াছি, তেমন ইহাদিগের চরিত্রেও সেইরূপ একটা ক্রমবিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়।

যখন কবি অভিরাম স্বামী চরিত্র করেন, তখনই তিনি ব্রাহ্মণপণ্ডিতের মর্য্যাদা, তাঁহাদিগের আধিপত্যরহস্য বিলক্ষণ অনুভব করিয়াছিলেন। কিন্তু আমাদিগের এই ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে মনে হয় যেন তাঁহার সেই সময়ে ব্যভিচার দোষটার প্রতি তাদৃশ ঘৃণা ছিল না। তিনি যেন মনে করিতেন, ব্রাহ্মণপণ্ডিতের মূল শক্তি ধর্ম্মে নহে—বিদ্যায় এবং বুদ্ধিতে। তাই আমরা ব্যভিচারী অভিরাম স্বামীকে অমন বলবান্ দেখিলাম। তবে অবশ্য একথা বলা যাইতে পারে যে, কবি তাঁহাকে যুগপৎ ব্যভিচাররত এবং ক্ষমতাশালী ও সম্মানিত করিয়া দেখান নাই। তিনি দেখাইয়াছেন, ব্যভিচার তাঁহার পূর্ব্বজীবনেই অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। তা' হউক, তবু যেন আমাদিগের অবিশ্বাসী বুদ্ধিতে এই মনে হয় যে, অভিরাম স্বামীর চিত্রে কবির ব্যভিচার দোষটা চন্দ্রের ... স্থাপিত হইয়াছে।

অভিরাম স্বামী ক্রমে মাধবাচার্য্যে পরিণত হইলেন। তখন তাঁহার পূর্ব্বদোষ ব্যভিচার দেখিলাম না—তাঁহার পূর্ব্বগুণই সম্যক্ বিকশিত দেখিলাম। অভিরাম স্বামীর চিন্তা হইতে মাধবাচার্য্যের চিন্তা অধিকতর প্রসারিত হইল—মাধবাচার্য্য যবনহস্ত হইতে হিন্দুরাজ্য উদ্ধার সঙ্কল্পে ব্রতী হইলেন। মাধবাচার্য্যই সাবেক ব্রাহ্মণপণ্ডিত রূপে প্রথমে কবির গ্রন্থমধ্যে স্থান পাইলেন।

পরে কপালকুণ্ডলায় এক অধিকারী দেখিলাম, তিনিও ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বটেন, কিন্তু যেমন কপালকুণ্ডলার সহিত, প্রথম স্তরের অন্য উপন্যাস দুইখানির বিশেষ সম্বন্ধ নাই, তেমনই এই অধিকারীর সহিতও অভিরাম স্বামী বা মাধবাচার্য্যের বেশী সম্বন্ধ দেখিলাম না। কাপালিকও ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, কিন্তু তিনি ভিন্ন পথাবলম্বী—কবি এখানে এই ধর্ম্মাবলম্বীর ব্যভিচার দেখাইয়া গিয়াছেন। পরে বিষবৃক্ষ, কৃষ্ণকান্তের উইলে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত দেখিতে পাইলাম না। কবি তখন যাহা দেখাইতে ব্যস্ত, তাহা দেখাইতে ব্রাহ্মণপণ্ডিত আবশ্যক হইল না। রজনীতে একবার একটা লোককে দেখিলাম কিন্তু সে প্রকৃত প্রস্তাবে ব্রাহ্মণপণ্ডিত নহে, সন্ন্যাসীমাত্র।

তাহার পরে যেমন কবির চিন্তার বিষয় সামান্য ভালবাসা হইতে সমগ্র জীবনের কর্ত্তব্যে প্রসারিত হইল—তেমনি মাধবাচার্য্য সত্যানন্দে পরিণত হইলেন। সত্যানন্দ তখন চাণক্য-রূপী—মাধবাচার্য্যের ন্যায় তিনি হেমচন্দ্রের মুখাপেক্ষী নহেন, তিনি স্বয়ং সাধক, স্বয়ং ব্রতী। সে

থা আমরা স্থানান্তরে বুঝাইয়াছি। সেই
ত্যানন্দই আমাদিগের বিবেচনায় ব্রাহ্মণ
ণ্ডিতের চরম বিকাশ। সত্যানন্দের
রে দেখিলাম—ভবানী পাঠককে।
যমন সত্যানন্দের সাধনা, ভবানীর ও
প্রায় তেমনই সাধনা। তবে সত্যানন্দের
ভক্তির বিকাশ যত বেশী হইয়া ছিল,
বানীপাঠকে আমরা ভক্তির তত বিকাশ
খি নাই—দেখিয়াছি জ্ঞানের বিকাশ।
ন্দ্রচূড় ও মাধবাচার্য্য প্রায় এক শ্রেণীর
রিত্র। তবে চন্দ্রচূড় কিছু অপেক্ষাকৃত আধুনিক রকমের—মাধবাচার্য্য হইতে যেন কিছু উন্নত।

এই সকল ব্রাহ্মণপণ্ডিত ব্যতীত আর এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ পণ্ডিতও কবির উপন্যাসে স্থান পাইয়াছে। তাঁহারা সিদ্ধ মহাপুরুষ। পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের গুরু। যথা চন্দ্রশেখরের গুরু ও সত্যানন্দের গুরু ইত্যাদি।

এই ব্রাহ্মণপণ্ডিত চরিত্র ভাবিয়া দেখিবার বিষয় বটে।

কবির জীবনচরিত।

আমাদিগের বোধ হয়, মহাকবির
ঘটনা-মূলক কোন জীবনচরিত থাকা
উচিত নহে। নেপোলিয়নের ন্যায় যুদ্ধ-
ীরের জীবনচরিত লিখিতে, তাঁহার
ন্ধবৃত্তান্ত বর্ণনা একান্ত আবশ্যক; বিদ্যা-
াগরের জীবন চরিত লিখিতে হইলে,
াহার দয়ার কার্য্য, দেশহিতকরকার্য্য
লির সমালোচনা একান্ত আবশ্যক;
ইরূপ কবির জীবনী লিখিতে হইলে
হার কার্য্যের সমালোচনাই প্রধানতঃ
বশ্যক। প্রকৃত কবির জীবনী সেই
ার্য্যেই থাকে। তাঁহার লিখিত কাব্য
উপন্যাস হইতেই তাহা বাছিয়া লইতে
য়। সেই জীবনী ব্যতীত বাকী
টুকু সচরাচর জীবনীতে লিখিত হয়,
হা সেই মানুষটির জীবনী হইতে
ারে, কিন্তু কবির জীবনী নহে। রাম,
াম, যদু, মধুর জীবনীও যেমন, উপ-
ামাদিতে প্রতিফলিত কবির জীবনী ছাড়া সেই কবি বলিয়া খ্যাত মানুষটির জীবনীও তেমন। আমরা তাহাতে কিছু মাত্র প্রভেদ দেখিতে পাই না। যদি কোন ভাগ্যবান ব্যক্তির আমাদের এই মহাকবির জীবনী লিখিতে প্রবৃত্তি হয়, সময় হয়, অর্থ হয় এবং ক্ষমতা হয়, তবে তিনি যেন রাম, শ্যাম, যদু, মধুর জীবনচরিতের ন্যায় বাহিরের ঘটনা দ্বারা সে জীবনী পরিপূর্ণ না করেন। সেক্সপিয়রের প্রকৃত জীবন-চরিত দুষ্প্রাপ্য—কিন্তু আমাদিগের বোধ হয়, তাহা আরও দুষ্প্রাপ্য হইলে জগতের বেশী উপকার হইত। সেক্সপিয়রের গ্রন্থে তাঁহার যে জীবনচরিত আছে, তাহাই আমাদিগের বিশেষ আলোচ্য; তদ্ভিন্ন তাঁহার অন্য কার্য্যের—আহার-বিহার প্রভৃতির ইতিহাস জানিলে লাভ কি? লাভ ত নাই—বরং ক্ষতি আছে। আমরা দুর্ব্বল মানব—আমরা বরং

রের আচরণ দেখি। ...স্তর অনুমান করিতে গিয়া ভ্রান্ত ...লেই পতিত হইতে পারি। তবে এমন যদি কোন মহাপুরুষ থাকেন, সাহসে নির্ভর করিয়া যিনি সেই বাহিরের আচরণেও অভ্যন্তরস্থ পদার্থের প্রতিকৃতি দেখাইতে পারেন, সামান্য তাসখেলা হইতেও দর্শনতত্ত্ব উদ্ভেদ করিয়া দেখাইতে পারেন, তবে তিনি এ চেষ্টা করুন, ক্ষতি নাই। নতুবা সেক্সপিয়রের ফলাপহরণ-কাহিনী পাঠকবর্গকে বলিয়া কবির এবং সেই লেখকের নিজের কলঙ্ক করা কাহারও কর্ত্তব্য নহে।

বিদায়।

মহাকবি! তবে বিদায় হই। এই কয়েক বৎসর তোমাকে ভাবিয়া তোমাকে দেখিয়া, তোমার পুস্তক পড়িয়া, যে কিরূপ আনন্দ অনুভব করিয়াছি, তাহা তোমারই ন্যায় না হইলে বলিতে পারিতেছি না। আমার সমস্তই তুমি। আমার জ্ঞান-বুদ্ধি, শিক্ষা দীক্ষা সকলই তোমা হইতে। এ জনমে তোমারই উপন্যাস ভিন্ন আর কিছু পড়িতে পারিলাম না। আমার সেক্সপিয়রও তুমি, কালিদাসও তুমি। আমার সাংখ্যও তুমি, পাতঞ্জলও তুমি; আমার উপনিষদও তুমি, গীতাও তুমি। আমি তোমার উপন্যাস পাঠে যে সুখলাভ করিয়াছি, এমন সুখ দাম্পত্যপ্রণয়ে উপভোগ করি নাই—আমি তোমার উপন্যাস পড়িয়া যে উপদেশ পাইয়াছি, এমন উপদেশ কোন গুরুর নিকটেও পাই নাই। শুধুই কি ইহাই? তাহা নহে। যখন রজনী-প্রভাতে মৃদুমন্দ সমীরণে শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া বিপুল আনন্দ উপভোগ করে, তখন তোমাকেই যেন তাহার মধ্যে দেখিতে পাই। যখন কাননমধ্যস্থ বৃক্ষপল্লবপরিবৃত কোকিল-কূজন হৃদয়টাকে বিশ্লেষণ করিয়া অনন্তের দিকে প্রসারিত করে, তখন তোমাকেই তাহার মধ্যে দেখিতে পাই। যখন স্নেহভাজন তনয়াগণ সম্মুখে আসিয়া হৃদয়ে স্নেহরাশি উদ্বেলিত করে, তখন তোমাকেই তাহার মধ্যে দেখিতে পাই—যখন ভক্তিভাজন জনক-জননীর অপত্য-স্নেহ দেখিয়া হৃদয় ভক্তি বিহ্বল হইয়া পড়ে, তখন তোমাকেই তাহার মধ্যে দেখিতে পাই। তোমার উপন্যাসের ন্যায় আমার এমন সুখের, এমন শিক্ষার, এমন হাসির এমন কান্নার সামগ্রী এ জনমে আর কিছুই হইতে পারিল না।

তবে যাও মহাকবি, তোমার সেই অনন্তধামে। অনন্তধামে সেই বৃহৎ বৃহত্তমে, মিশাইয়া যাও—সেই বিশাল বিশালতমে, মহত্তর মহত্তমে মিশাইয়া যাও—সেই গুরুতর গুরুতমে, প্রিয়তর প্রিয়তমে মিশাইয়া যাও। আমরা ব্যা... ভাবেই তোমাকে এতদিন দেখিয়াছি

এখন সমষ্টিরূপে দেখিয়া জীবন সার্থক করি।

তবে তোমরাও বিদায় হও, দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী—বিষবৃক্ষ, ইন্দিরা, চন্দ্রশেখর—কৃষ্ণকান্তের-উইল—রজনী, রাজসিংহ—আনন্দমঠ, দেবীচৌধুরাণী, সীতারাম—তোমাদিগের নিকটেও বিদায় লইতেছি। তোমরা যে প্রভুর পালিত, যাঁহার আশ্রিত, যাঁহা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত, তাঁহার সিংহাসন যত্নপূর্ব্বক রক্ষা কর। যদি কোন ভোজরাজ পাত্রমিত্রসহ ইহাতে উপবেশন করিতে আগমন করেন, তবে এক এক করিয়া তোমরা তাঁহার গুণ কীর্ত্তন করিও—তাহা হইলেই কেহ এ সিংহাসন অধিকার করিতে সাহস করিবে না। তবে ব্যক্তিবিশেষকে দয়া করিয়া এ সিংহাসনে উঠিতে নিষেধ করিও না। কারণ সেই অপূর্ব্ব দৃশ্যে অনেকেরই বিশেষ আনন্দ জন্মিবার সম্ভাবনা ইহাই আমার শেষ নিবেদন।

সমাপ্ত।

বঙ্কিমচন্দ্র।

উপন্যাসাবলীর সংক্ষিপ্তসার।

আনন্দমঠ।

১১৭৬ সালে ঘোরতর দুর্ভিক্ষে যখন বাঙ্গালাদেশের অনেকাংশ ছারখার হইতেছিল, সেই সময়ে পদচিহ্ন গ্রামের এক ধনবান্ ব্যক্তি জনশূন্য গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া সহরে যাইতেছিলেন। তাঁহার নাম—মহেন্দ্রসিংহ—সঙ্গে স্ত্রী কল্যাণী ও এক শিশু বালিকা। পথিমধ্যে মহেন্দ্র স্ত্রী কন্যার জন্য আহার্য্য অনুসন্ধানে গমন করিলে একদল শীর্ণকায় দস্যু আসিয়া কল্যাণী ও তাঁহার কন্যাকে ধরিয়া লইয়া গেল। বনমধ্যে গিয়া কল্যাণীর দেহাপহৃত অলঙ্কারের বিভাগ লইয়া তাহারা কলহে মত্ত হইলে কল্যাণী সুযোগ বুঝিয়া তথা হইতে অন্তর্হিত হইল। সে বনমধ্যে কিছুদূর গমন করিলে এক শুভ্রকেশ শুভ্রবসন ঋষিমূর্ত্তি আসিয়া তাহাকে অভয়দান পূর্ব্বক স্বীয় আশ্রমে লইয়া গেলেন। এই ঋষিতুল্য ব্যক্তির নাম সত্যানন্দ। তিনি কল্যাণীকে আশ্রয় দিয়া মহেন্দ্রের অনুসন্ধানে ভবানন্দ নামে এক শিষ্যকে পাঠাইলেন।

মহেন্দ্র স্ত্রী ও কন্যা হারাইয়া রাজপুরুষদিগের সহায়তা গ্রহণের জন্য নগর অভিমুখেই যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে তাঁহার হাতে বন্দুক দেখিয়া একদল নবাবের সিপাহী তাঁহাকে দস্যু মনে করিয়া গ্রেপ্তার করিল। ভবানন্দ সত্যানন্দের অনুগত সন্ন্যাসী সেনার সাহায্যে সিপাহীদিগকে পরাস্ত করিয়া মহেন্দ্রের উদ্ধারসাধন করিলেন এবং তাঁহাকে স্ত্রী ও কন্যার সহিত সাক্ষাৎ করাইবার জন্য লইয়া চলিলেন। পথিমধ্যে তাঁহার মুখে "বন্দে মাতরং" গীত ও দেশের দুরবস্থার কথা শুনিয়া মহেন্দ্রের হৃদয়ে "সন্তান ধর্ম্ম" গ্রহণের বাসনা হইল। অতঃপর সত্যানন্দ তাঁহাকে মঠস্থিত মাতৃমূর্ত্তির দর্শন করাইলে তিনি দীক্ষাগ্রহণে দৃঢ়সঙ্কল্প হন। তখন স্ত্রী কন্যাকে পুনরায় ঘরে রাখি

বার আবশ্যক বোধ হওয়ায় পুনরায় তিনি পদচিহ্নাভিমুখে গমন করেন। কল্যাণীর সঙ্গে বিষের কৌটা ছিল। এক নদীতীরে তাঁহারা বিশ্রাম করিতেছিলেন, এমন সময় কন্যা সুকুমারী সেই কৌটা লইয়া খেলা করিতে করিতে বিষবড়ী গালে পুরিল। তাহার ফলে সে অচৈতন্য হইলে কল্যাণী শোককাতরা হইয়া ঐ বড়ী বাহির করিয়া স্বয়ং ভক্ষণ করিলেন। কাজেই তিনিও সংজ্ঞাশূন্য হইলেন। মহেন্দ্র এই ঘটনায় অতীব কাতর হইলেন। এমন সময় সত্যানন্দ আসিয়া তাঁহাকে দেখা দিয়া সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন।

পূর্ব্বে যে একদল সিপাহী সন্ন্যাসী-সেনার হস্তে পরাভূত হইয়াছিল, তাহাদের অবমাননার প্রতিকারার্থ সন্ন্যাসী ধরিবার জন্য রাজাদেশে একদল লোক ছুটিল। তাহারা নদীতীরে সত্যানন্দকে গৈরিক-বসনধারী দেখিয়া গ্রেপ্তার করিল, মহেন্দ্রও বাদ পড়িলেন না। উভয়েই নগরের কারাগারে অবরুদ্ধ হইলেন, কিন্তু সেই রাত্রেই সন্ন্যাসী-সেনা আসিয়া নগর আক্রমণ পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে কারামুক্ত করিয়া লইয়া গেল। এদিকে জীবানন্দ ও ভবানন্দ নামক দুই সন্ন্যাসীর চেষ্টায় মহেন্দ্রের স্ত্রী কন্যা রক্ষা পাইল। আরণ্য লতা-বিশেষের রস সেবনে ভবানন্দ কল্যাণীকে বাঁচাইয়াছিলেন। কন্যা সুকুমারীকে জীবানন্দ স্বীয় ভগিনীর নিকট রাখিয়া আসিল। এদিকে মহেন্দ্র সত্যানন্দের নিকট "সন্তান ধর্ম্মে" দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। সত্যানন্দ তাঁহাকে পদচিহ্ন গ্রামে গড় নির্ম্মাণ করিয়া তদভ্যন্তরে গোলা গুলি প্রস্তুত করিবার কারখানা স্থাপন করিতে উপদেশ করিলেন।

এই সময়ে জীবানন্দ গোঁসাইয়ের স্ত্রী শান্তি নবীন সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করিয়া সত্যানন্দের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিল। সে স্বামীর বিরহে কাতর হইয়া ও স্বামীকে সকল বিষয়ে সহায়তা করিবার জন্য আসিয়াছিল। সত্যানন্দ পরে বুঝিতে পারিলেন যে, সেই নবীন সন্ন্যাসীই শান্তি। শান্তির দেহে অসাধারণ বল ছিল। তাহার মনের বল তদপেক্ষা অধিক ছিল। সে আনন্দমঠেই স্থান পাইলে সুকুমারীকে ভগিনীর নিকট রাখিতে যাইবার সময় জীবানন্দ শান্তির মুখ দর্শন করিতে বাধ্য হইয়াছিল তদবধি সে তাহার প্রায়শ্চিত্ত মৃত্যু স্থির করিয়া রাখিয়াছিল।

এদিকে ভবানন্দ কল্যাণীর রূপে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। কল্যাণীকে সে কথা জানাইয়াও ছিলেন। কিন্তু কল্যাণী তাহার পাপ প্রস্তাবে সম্মত হয় নাই তখন ভবানন্দের চৈতন্য হইল, তিনি অনুতপ্ত হইলেন। কিন্তু তদবধি ভবানন্দেরও মৃত্যু প্রায়শ্চিত্ত অবধারিত হইয়া রহিয়াছে।

এই সন্তানদিগের বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য ইংরেজেরা কয়েকবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু পারেন নাই। পরিশেষে কাপ্তেন টমাস নামক এক ইংরাজ বীর-বিশেষ কৌশল সহকারে যে বনে সন্তানগণের প্রধান আড্ডা ছিল সেই বন চারিদিক্ হইতে আক্রমণ করিলেন। সন্তানেরা অতুল সাহসের সহি

যুদ্ধ করিল। কিন্তু ইংরাজের তোপের সম্মুখে দাঁড়াইতে পারিল না। পশ্চাৎ হইতে তোপ পৌছিবার পূর্ব্বেই সন্তান-সৈন্য ইংরাজ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া পর্য্যুদস্তপ্রায় হইল। এমন সময় মহেন্দ্রের কামান আসিয়া পড়ায় রণভূমি অন্য মূর্ত্তি ধারণ করিল। ইংরাজ সেনা সমস্ত বিধ্বস্ত হইল। কিন্তু ভবানন্দ সেই যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিয়া আপনার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিল। সন্তানদিগের জয়লাভ হইল। বরেন্দ্রভূমি নিষ্কণ্টক হইল। সত্যানন্দের আদেশে মহেন্দ্র ব্রত সমাপ করিয়া পুনরায় সংসারী হইলেন।

ইহার পর আর একটা যুদ্ধ হইল। সে যুদ্ধেও ইংরাজেরা প্রথমে বিজয়ী হইয়াছিলেন। পরে সত্যানন্দ সহস্রাধিক সংখ্যক সন্তানসেনা লইয়া উপস্থিত হওয়ায় সন্তানসেনা জয়লাভ করিল। এ যুদ্ধে জীবানন্দের পতন হয়। শান্তি তাঁহার শবদেহ রণভূমি হইতে বহুকষ্টে খুঁজিয়া বাহির করিলে এক মহাপুরুষ আসিয়া মৃতপ্রায় জীবানন্দকে ঔষধ-দানে সঞ্জীবিত করিলেন। অতঃপর শান্তি ও জীবানন্দ হিমালয়ে গমন পূর্ব্বক কুটির নির্ম্মাণ করিয়া আজীবন ব্রহ্মচর্য্যে দেশ-সেবায় যাপন করিলেন।

সত্যানন্দ রণজয় করিয়া মঠে ফিরিয়া আসিলে সেই মহাপুরুষ সহসা আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন;—তোমার কার্য্য সিদ্ধ হইয়াছে, মুসলমান-রাজ্য ধ্বংস পাইয়াছে। ইংরাজের সুশাসনে লোক সুখী ও ধার্ম্মিক হইবে। অতএব এ অধ্যবসায় পরিত্যাগ কর।" এই বলিয়া তিনি সত্যানন্দকে হিমাচল-শিখরে মাতৃ মন্দির দেখাইবার জন্য লইয়া গেলেন।

দেবীচৌধুরাণী।

দেবী চৌধুরাণী। এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের কন্যা। পিতামাতা তাহার নাম রাখিয়াছিলেন প্রফুল্ল। অল্পবয়সে প্রফুল্লের পিতৃবিয়োগ হয়। দরিদ্র কন্যা হইলেও সুন্দর বলিয়া, বরেন্দ্রভূমির ভূতনাথ গ্রামনিবাসী হরবল্লভ রায় নামক জনৈক ধনবান ব্যক্তি স্বীয় পুত্রের সহিত তাহার বিবাহ দিয়াছিলেন। প্রফুল্লের বিধবা মাতা সর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়া কন্যার উদ্বাহ সম্পন্ন করিল কিন্তু কন্যাযাত্রীরা উত্তম খাদ্য না পাইয়া তাহার সর্ব্বনাশ করিল। তাহারা রটাইয়া-দিল যে, প্রফুল্ল বাগদীর মেয়ে, তাহার জননী ভ্রষ্টা! সুতরাং হরবল্লভ বিবাহের পরদিন হইতেই পুত্রবধূকে ত্যাগ করিলেন।

এদিকে প্রফুল্লের বয়স ১৮ বৎসর হইল। মাতা চরকা কাটিয়া ও প্রতিবেশীদের নিকট ভিক্ষা করিয়া অতিকষ্টে দিনপাত করিতেন। প্রফুল্ল ইহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া এক দিন শ্বশুর গৃহে যাইবার প্রস্তাব করে। তাহার মাতা অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাহাকে শ্বশুরবাড়ী লইয়া গেল। কিন্তু

শ্বশুর তাহাকে গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন না। শাশুড়ী তাহার সৌন্দর্য্যে ও মধুর কথায় মুগ্ধ হইয়া তাহার অনেক কথা হরবল্লভকে বলিলেন। কিন্তু তাহাতে কোনও ফল হইল না তিনি বরং ক্রুদ্ধ হইয়া পুত্র ব্রজেশ্বরকে আদেশ করিলেন, "ও বাগদীর মেয়েটাকে তাড়িয়ে দাও।" ব্রজ সে আদেশ পালনার্থ যে ঘরে প্রফুল্ল ছিল, তথায় গেল। সেই সময়ে সাগর নাম্নী প্রফুল্লের সপত্নী তাহাদিগের উভয়কে ঐ গৃহে রুদ্ধ করিয়া বাহির হইতে কুলুপ লাগাইয়া দিল। প্রভাতে প্রফুল্ল সে গৃহ ত্যাগ করিল। বিদায় কালে তাহার স্বামী তাহাকে একটী অঙ্গুরীয় দানকরিয়াছিলেন।

তথা হইতে গৃহে ফিরিবার দিন কয়েক পরেই প্রফুল্লের মাতার মৃত্যু হইল। অতঃপর গ্রামের জমিদারের গোমস্তা ষড়যন্ত্র করিয়া প্রফুল্লকে হরণ করিবার বন্দোবস্ত করিল। একদিন রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় সে প্রফুল্লের ঘরে গোপনে প্রবেশ পূর্ব্বক তাহার মুখ বন্ধ করিয়া তাহাকে পাল্কীতে তুলিল। পথিমধ্যে দুই জন হিন্দুস্থানি জোয়ানকে দেখিয়া বেহারাদের দস্যুভ্রম হওয়ায় তাহারা ভয়ে পাল্কী ফেলিয়া পলাইল। গোমস্তা ও সেই পথাবলম্বী হইল।

শিবিকাগত হইবার পর প্রফুল্লের ঘুম ভাঙ্গিয়াছিল। এতক্ষণ সে স্বহস্তে মুখের বন্ধন মোচন করিয়াছিল। উপস্থিত বিপদ অতিক্রান্ত হইলে সে পাল্কী হইতে বাহির হইল এবং আত্মগোপন করিবার উদ্দেশে বনমধ্যে প্রবেশ করিল। বনের মধ্যে একটি ভগ্ন গৃহে এক মুমূর্ষু বৃদ্ধের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়। এব্যক্তি বৈষ্ণব। বৈষ্ণবী তাহার মৃত্যু সন্নিকট জানিয়া সর্ব্বস্ব লইয়া পলায়ন করিয়াছিল কিন্তু বৃদ্ধের কিছু ধন প্রোথিত ছিল। প্রফুল্ল মৃত্যুকালে বৃদ্ধের সেবা শুশ্রূষা করায় সে ঐধন তাহাকেদিয়া যায়। বৃদ্ধকে সমাধিস্থ করিবার পর প্রফুল্ল দেখিল, বিংশতি কলস পূর্ণ স্বর্ণ মুদ্রা ঐ ঘরের নীচে প্রোথিত আছে। প্রফুল্ল তাহা গ্রহণ করিল ও পরদিন একটি মোহর লইয়া হাটের সন্ধানে চলিল।

পথিমধ্যে ভবানীপাঠক নামক দস্যুদলপতির সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। সে প্রফুল্লকে সর্ব্বসুলক্ষণ যুক্তা দেখিয়া তাহাকে একটা দোকান দেখাইয়া দিবার ছলে একটা কুটীরে লইয়া গেল। তথায় তাহাকে আত্মপরিচয় দিয়া তাহার অবস্থা জানিয়া লইল, প্রফুল্ল তাহার শরণাপন্ন হইলে, সে তাহাকে প্রাপ্তধনের সদ্ব্যবহার শিখাইবার জন্য গীতোক্ত নিষ্কাম ধর্ম্মতত্ত্বের শিক্ষাদিতে লাগিল। প্রফুল্ল তাহার তত্ত্বাবধানে থাকিয়া ৫ বৎসরে কঠোর আত্মসংযম ও নিষ্কাম ব্রত শিক্ষা করিল। তখন ভবানীঠাকুর তাহাকে বলিল, "এখন দেশে সর্ব্বত্র অরাজকতা। এজন্য আমি ডাকতি অর্থাৎ দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করি। তোমার ধন ও তুমি এই কার্য্যে ব্যয় কর। সাজসজ্জা করিয়া আমার সঙ্গে চল। দীনদুর্ব্বলের রক্ষায় ধনদিয়া সহায়তা কর।" প্রফুল্ল প্রথমে ইহাতে অসম্মতা হইলেও দেশের অবস্থা ও ভবানীঠাকুরের কার্য্য প্রণালীর কথা শুনিয়া এইরূপ ডাকাতিতে যোগদান করিল। ৫ বৎসর তাহার এই কার্য্যে কাটিয়া গেল।

এই কয়বৎসরে হরবল্লভের অবস্থা নিতান্ত শোচনীয় হইয়া উঠিল, চারিদিকে ঋণ হইল, ইজারাদার দেবীসিংহের ৫০ হাজার টাকা খাজনা পাওনা হইল। ব্রজেশ্বরের অন্য পত্নী সাগরবালার পিতার অনেক টাকা ছিল ব্রজেশ্বর তাই তাহার নিকট টাকা ধার করিতে চলিল সাগরের পিতার সহিত হরবল্লভের বড় ভাব ছিল না সাগরও সেজন্য শ্বশুরের আদরে বঞ্চিতা ছিল। তাহার পিতা হরবল্লভের মহাজন শোধ করিবার জন্য টাকা ধারদিতে চাহিল না। এতদুপলক্ষে শ্বশুর জামাইয়ে যথেষ্ট কটুকাটব্য প্রয়োগ হইল। ব্রজেশ্বর ক্রোধে শ্বশুর গৃহ পরিত্যাগ করিলেন

প্রফুল্ল ভবানীপাঠকের দলে মিশিয়া দেবীচৌধুরাণী নামে প্রসিদ্ধ হইল। তখন সেনামে দেশের আবাল বৃদ্ধ বনিতা কম্পিত হইত। সকলেই তাহাকে দস্যু দলের নেত্রী বলিয়া জানিত, বর্ষাকালের জ্যোৎস্না রাত্রিতে দেবী একটা বজরায় ত্রিস্রোতাগর্ভে বিরাজ করিতে ছিলেন। ব্রজেশ্বর শ্বশুর গৃহ হইতে ফিরিয়া আসিবার সময় ঐ নদীর মধ্য দিয়া স্বীয়নৌকা যোগে গমন করিতে ছিলেন। দেবীর আদেশে তিনি সহসা একদল দস্যু কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া বজরায় আনীত হইলেন। সাহসী ব্রজেশ্বর ইহাতে ভীত হইল না। তিনি অতীব নির্ভীকতার সহিত দেবীর সহিত উত্তর প্রত্যুত্তর করিলেন। বজরায় দেবীর কাণ্ড কারখানা দেখিয়া ব্রজেশ্বর বিস্মিত হইয়াছিলেন, পরিশেষে অনুরোধে পড়িয়া তথায় জলযোগ করিলেন। ব্রাহ্মণ ভোজনের দক্ষিণা স্বরূপ দেবী তাঁহাকে ৫০ সহস্র মুদ্রা ধার দিলেন ও একটি অঙ্গুরীয় তাহার হস্তে পরাইয়া দিলেন। এই অঙ্গুরীয়টি তিনি ব্রজেশ্বরেরই নিকট পূর্ব্বে পাইয়াছিলেন একবৎসর পরে বৈশাখ শুক্লা সপ্তমীদিবসে টাকা শোধ করিবার কথা হইল।

ব্রজেশ্বর ইহার পূর্ব্বে শুনিয়াছিল, প্রফুল্ল মরিয়াছে। স্বগৃহ হইতে তাহার অপহৃত হইবার বার্ত্তা শেষে পূর্ব্বোক্তরূপে ব্রজেশ্বরের কর্ণে পঁহুছিয়া ছিল। তিনি পত্নী শোকে ম্রিয়মাণ হইয়াছিলেন। কিন্তু অদ্যকার ঘটনার ফলে গৃহে প্রত্যাগমনকালে দেবীর প্রদত্ত অঙ্গুরীয়ের লেখা পাঠ করিয়া প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইলেন। কিন্তু প্রফুল্ল ডাকাতি করে ভাবিয়া বড় ক্ষুণ্ণ হইলেন।

এদিকে বৈশাখী সপ্তমী নিকটবর্ত্তী হইল। হরবল্লভ টাকা পরিশোধের কোনও উপায়ই করিল না। সে শুনিয়াছিল, ব্রজেশ্বর দেবীর নিকট টাকা লইয়াছে যেখানে টাকা লইয়া উপস্থিত হইলে দেবীর দেখা হইবে, তাহাও সে শুনিয়াছিল। কাজেই সে দেবীকে ইংরাজ হস্তে ধরাইয়া দিয়া টাকার দায় হইতে উদ্ধার পাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। সে রংপুরের কালেক্টরকে সংবাদ দিয়া ৫ শত সিপাহী সৈন্যসহ কাপ্তেন ব্রেনানকে লইয়া নির্দ্দিষ্ট ঘাটের সমীপবর্ত্তী হইল। ইংরাজেরা দেবীকে চারিদিক্ হইতে আক্রমণ করিবার যথাসাধ্য বন্দোবস্ত করিলেন। দেবী এ সকল জানিয়া শুনিয়াও কেবল ব্রজেশ্বরের সন্দর্শন বাসনায় যথাসময়ে ঘাটে উপস্থিত হইল। আজ তাহার রাণীর যোগ্য বেশ ভূষা নাই। সজ্জ লোকজনও নাই—কাঁপি

অন্য মৃত্যু নিশ্চয় ইহা দেবী জানিয়াছিল। তদ্ভিন্ন নিজের জন্য দশজন অনুচরের প্রাণনাশে তাহার ইচ্ছা ছিল না। বিশেষতঃ দেবী আত্মরক্ষার চেষ্টা করিলে হরবল্লভের অমঙ্গল হইতে পারে। ব্রজেশ্বর সেদিন রাত্রিকালে দেবীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিল, টাকা দুই চারি দিন পরে দেওয়া হইবে। কিন্তু আর দেবীর সহিত সাক্ষাৎ হইবে না। প্রফুল্লের মুখে এই কথা শুনিয়া সে বিস্মিত হইল। তখন প্রফুল্ল তাহাকে সকল কথা বুঝাইয়া বলিল। ব্রজেশ্বর তাহাকে দস্যুদলের নেত্রী বলিয়া ভৎসনা করিতে যাইতেছিল; কিন্তু পারিল না। দেবী স্বীয় নির্দ্দোষতার কথা ও সমস্ত আত্মচরিত্র তাহাকে বিদিত করিলে সে বিস্মিত হইল ও দেবীকে গৃহে লইয়া যাইবার সংকল্প করিল। কিন্তু তাহার পিতাকে বর্ত্তমান বিপদের মূল জানিয়া সে হতাশ হইল। তথাপি পিতার প্রতি তাহার ভক্তিহ্রাস হইল না। সে পিতাকে অগ্রে বাঁচাইবার জন্য দেবীকে অনুরোধ করিল, দেবী পূর্ব্বাবধিই সেজন্য আত্মপ্রাণ বিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত হইয়াছিল। এদিকে দেবীর রক্ষার জন্য ভবানী ঠাকুর একহাজার বরকান্দাজ লইয়া উপস্থিত হইলেন। কিন্তু দেবী তাঁহাকে যুদ্ধে নিবৃত্ত হইতে আদেশ করিলেন। কিন্তু ঠাকুরজি সে কথা না শুনিয়া ইংরাজের সহিত যুদ্ধ প্রবৃত্ত হইলেন। দেখিয়া দেবী বিরক্ত হইয়া বজরা হইতে শাদা নিশান তুলিলেন, সন্ধিসূচক নিশান দেখিয়া ইংরাজ যুদ্ধ বন্ধ করিল, দেবী আত্মসমর্পণ করিবেন বলিয়া ইংরাজের নিকট দূত পাঠাইলেন। দেবীর আদেশে ভবানীঠাকুর হাজার বরকান্দাজসহ অন্তর্হিত হইল।

দেবীর দূত রঙ্গরাজ কাপ্তেন সাহেবকে জানাইলেন যে, দেবী ধরা দিতে প্রস্তুত, কিন্তু বজরা ছাড়িতে রাজী নহেন। সাহেব সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া বজরায় উঠিলেন। সেখানে গিয়া দেবীকে তদন্ত করিলেন। কিন্তু নৌকায় যে তিনজন স্ত্রীলোক ছিল, সকলেই আপনাকে দেবী বলিয়া পরিচয় দিতে লাগিল। তখন সাহেব দেবীকে চিনিবার জন্য গোইন্দা হরবল্লভকে ডাকিলেন। তিনিও দেবীকে সনাক্ত করিতে পারিলেন না। তখন ব্রজেশ্বরকে ডাক পড়িল। সে দেবীর নিশান দিহি করিতে অসম্মতি প্রকাশ করিলে সাহেব তাহাকে গালি দিলেন। ব্রজেশ্বর উত্তরে চপেটাঘাতে সাহেবকে ধরাশায়ী করিল।

এদিকে পূর্ব্ব হইতে আকাশে মেঘ জমিতেছিল। এই সময়ে তাহা প্রবল তুফানে পরিণত হইল। দেবী সেইজন্যই অপেক্ষা করিতেছিলেন। বায়ুর বেগ বুঝিয়া তিনি বজরা খুলিতে হুকুম দিলেন। নিমেষ মধ্যে বায়ুবেগে বজরা সন্ধ্যার অন্ধকারে অদৃশ্য হইল। সাহেব ফৌজ দূরে পড়িয়া রহিল। বজরাস্থিত সাহেব ও হরবল্লভ দেবীর বন্দী হইলেন। হরবল্লভ প্রাণের ভয়ে আকুল হইয়া কাঁদিতে লাগিল। দেবীর এক সঙ্গিনী তাঁহাকে বলিল যে তিনি যদি স্বীয় পুত্রের সহিত দেবীর দলের কোনও ২৫।৩০ বৎসরা অবিবাহিতা বাকিস্যার বিবাহে সম্মত হন, তাহা হইলে তিনি মুক্তিলাভ করিতে

পারেন। হরবল্লভ হাতে স্বর্গ পাইলেন। তাঁহাকে বোজদন্তের উদ্যোগ করিবার জন্য অগ্রে বাড়ী পাঠাইয়া দেওয়া হইল। ব্রজেশ্বর প্রফুল্লকে লইয়া তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইল। সাহেবকে পাথেয় দিয়া মুক্ত করা হইল।

ব্রজেশ্বর পিতাকে প্রবঞ্চনা করিল না। প্রফুল্লের প্রকৃত পরিচয় তাঁহাকে দান করিল। তিনিও আর কোনও উচ্চবাচ্য করিলেন না। লোকের নিকট প্রফুল্ল তদবধি নূতন বৌ নামে পরিচিত হইল। তারপর কিছুদিন ঘরকন্না করিয়া ইহলোক ত্যাগ করিল।

সীতারাম।

প্রায় ২০০ দুইশত বৎসর পূর্ব্বে পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় ভূষণা নগরীতে বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা মুরশীদকুলীখাঁর নিযুক্ত একজন ফৌজদার বাস করিতেন। একদিন ঐ নগরীর একটী সরু পথ দিয়া গঙ্গারাম দাস নামে একজন পথিক তাড়াতাড়ি যাইতেছিল। দৈবক্রমে তাহার পদ ঐ পথিমধ্যে শায়িত এক ফকিরের অঙ্গে স্পৃষ্ট হওয়ায় ফৌজদারের আদেশে ঐ পথিকের জীবিত অবস্থায় কবর দিবার হুকুম হইল।

গঙ্গারাম দাসের সংসারে তাহার একমাত্র ভগিনী ছিল, উহার নাম শ্রী—। শ্রী বড়ই রূপবতী। ভূষণার তদানীন্তন জমিদারের পুত্র সীতারাম রায়ের সহিত শ্রীর বিবাহ হয়। একজন দৈবজ্ঞ শ্রীর জন্মকোষ্ঠী দেখিয়া বলেন, শ্রী প্রিয় ব্যক্তির প্রাণহন্ত্রী হইবে। সীতারামের পিতা তজ্জন্য শ্রীকে আর গৃহে আনেন না। পিতৃগৃহে থাকিয়া শ্রী যৌবনে পদার্পণ করেন। গঙ্গারামের প্রাণদণ্ডাজ্ঞার সংবাদে ব্যাকুল হইয়া শ্রী সীতারামের সহিত সাক্ষাৎ করিল। শ্রীর অপূর্ব্ব রূপ-লাবণ্যে বিমুগ্ধ হইয়া সীতারাম রায় শ্রীর অনুরোধে গঙ্গারামকে রক্ষা করিতে প্রতিশ্রুত হন এবং রাত্রিকালে স্বীয় গুরু ও মন্ত্রী চন্দ্রচূড় তর্কালঙ্কারের সহিত পরামর্শ করিয়া সীতারাম হিন্দুগণের সাহায্যে পরদিন সদলবলে গঙ্গারামকে বধ্যভূমি হইতে উদ্ধার করিলেন। এতদুপলক্ষে হিন্দু-মুসলমানে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সেই সময় শ্রী চন্দ্রচূড় তর্কালঙ্কারের সহিত দূরে একস্থানে আরোহণ করিয়া যুদ্ধ দেখিতেছিলেন। তিনি রণচণ্ডীর ন্যায় অঞ্চল দুলাইয়া হিন্দুগণকে যুদ্ধে উৎসাহিত করায় অচিরে হিন্দুদের জয়লাভ হইল, তারপর ফৌজদার স্বয়ং সসৈন্যে আসিতেছেন শুনিয়া হিন্দুরা পলাইল। সেইদিন শ্রী সীতারামকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল যে, কেন সে পরিত্যক্তা হইয়াছে। সীতারাম বলিলেন, তিনি পিতার আদেশে পুনরায় বিবাহ করিতে বাধ্য হইলেও এখনও শ্রীকে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছেন। কিন্তু শ্রী প্রিয়-প্রাণহন্ত্রী হইবার আশঙ্কায় তাঁহার প্রিয়জনের নিকট হইতে দূরে থাকাই সঙ্গত বিবেচনা করিলেন এবং সহসা অন্ধকারে কোথায় চলিয়া গেলেন। সীতারাম স্বয়ং

ও চর পাঠাইয়া বহুদিন পর্য্যন্ত বহুস্থানে শ্রীর অনুসন্ধান করিয়াছেন, তথাপি তাঁহাকে পাইলেন না।

ওদিকে সীতারাম শ্যামপুরে নূতন নগরী নির্ম্মাণ করিয়া হিন্দুরাজ্য স্থাপনে সচেষ্ট হইলেন। অল্প সময়ের মধ্যে ভূষণা হইতে মুসলমানের অত্যাচারে পীড়িত সহস্র সহস্র প্রজা আসিয়া শ্যামপুরে বাস করিল। শ্যামপুর মহাসমৃদ্ধিশালী নগর হইল। সীতারাম নবাবের পরিতোষের নিমিত্ত শ্যামপুরের নাম মহম্মদপুর রাখিলেন এবং নিয়মিতরূপে নবাব সরকারে কর পাঠাইতে লাগিলেন। ইহাতে কিছুদিন ফৌজদার চুপ করিয়া রহিলেন, কিন্তু সর্ব্বদাই সীতারামের নগরী আক্রমণের ছল অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। কিছুদিনে গুজব উঠিল, ফৌজদার শীঘ্রই মহম্মদপুর আক্রমণ করিবে।

এই সময় সীতারাম কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া দিল্লী যাত্রা করিলেন। সেনাপতি মৃন্ময়, গঙ্গারাম ও চন্দ্রচূড় তর্কালঙ্কারের উপর রাজ্যরক্ষার ভার অর্পিত হইল। সীতারাম মহম্মদপুরে নাই শুনিয়া তোরাব খাঁ মহম্মদপুর আক্রমণের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ভয়ে অনেকে মহম্মদপুর ত্যাগ করিয়া যাইতে লাগিল। সীতারামের কনিষ্ঠা রাণী রমা এ সংবাদে যারপর নাই ভীতা হইলেন। তিনি মধ্যমা রাণী নন্দাকে পর্য্যন্ত না জানাইয়া মুরলা নাম্নী পরিচারিকা দ্বারা নগররক্ষক গঙ্গারামকে গভীর রাত্রে অন্তঃপুরে আনাইয়া ফৌজদারের হস্ত হইতে রাজপরিবারের রক্ষার পরামর্শ করিতে লাগিলেন। গঙ্গারাম রমার রূপে মুগ্ধ হইয়া ঘন ঘন অন্তঃপুরে আসিত। রমা এক্ষণে তাহার অভিপ্রায় বুঝিয়া তাহাকে আসিতে নিষেধ করিলেন। কিন্তু গঙ্গারাম ছোট রাণীর আশা ত্যাগ করিল না; সে গোপনে ভূষণার ফৌজদারের নিকট গিয়া ফৌজদারের নগর-আক্রমণে সাহায্য করিবে বলিয়া জানাইল এবং ইহার পুরস্কার স্বরূপ লুণ্ঠনের দ্রব্যের অর্দ্ধেক ও ছোট রাণীকে মুসলমানের সাহায্যে হস্তগত করিতে স্থির করিল। ফৌজদার তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া একদিন অতর্কিতভাবে নগর আক্রমণ করিল।

ওদিকে শ্রী সন্ন্যাসিনী সাজিয়া তীর্থদর্শন উপলক্ষে পুরুষোত্তমে যাত্রা করিলেন। পথে বৈতরণী নদীর তীরে জয়ন্তী নাম্নী আর এক সন্ন্যাসিনীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তিনিই শ্রীকে নিষ্কাম ধর্ম্ম শিক্ষা দেন। এদিকে সীতারাম শ্রীকে না পাইয়া দিন দিন উৎকণ্ঠিত হইতে লাগিলেন। সে যাহা হউক, ফৌজদারের নগর-আক্রমণের সংবাদ জয়ন্তী ও শ্রী পূর্ব্বে জানিতে পারিয়া যথাসময়ে মহম্মদপুরে আসিয়া যুদ্ধায়োজন করিলেন। দৈবক্রমে সীতারামও সেই রাত্রিতে তথায় উপস্থিত হইলেন। সন্ন্যাসিনীদ্বয়ের সাহায্যে সেদিন সীতারামের জয়লাভ হইল।

এদিকে গঙ্গারামের গভীর রাত্রে অন্তঃপুরে আগমনের ব্যাপার লইয়া নানা লোকে নানা কথা বলিতে লাগিল। সেই কলঙ্কের স্খালন জন্য সীতারামের দরবার বসিল। সাক্ষ্য প্রমাণ গৃহীত হইল। ছোট রাণী রমা নিষ্কলঙ্ক বলিয়া সপ্রমাণ হইলেন। মুরলা ও গঙ্গারামের মৃত্যুর

আদেশ হইল। কিন্তু সেই সন্ন্যাসিনী জয়ন্তী আসিয়া সীতারামের নিকট তাহার প্রাণ ভিক্ষা চাওয়ায় সে মুক্তিলাভ করিল। গঙ্গারামের মুক্তির বিনিময়ে জয়ন্তী শ্রীর সহিত সীতারামের মিলন করাইবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত ছিলেন। তদনুসারে গভীররাত্রে শ্রী সন্ন্যাসিনী-বেশে সীতারামের শয়ন-গৃহে উপনীত হইলেন, কিন্তু তিনি সীতারামের শয্যাস্পর্শ করিলেন না, সীতারাম শ্রীকে সংসারে আনিবার জন্য বহু চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সন্ন্যাসিনী শ্রী সম্মত হইলেন না, শেষে চিত্তবিশ্রাম নামক নগরের প্রান্তবর্ত্তী কোন ভবনে শ্রী বাস করিতে লাগিলেন। রাজা প্রতিদিন সেখানে যাইতেন, কিন্তু তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পাইতেন না, ইহাতে তাঁহার আকাঙ্ক্ষা বাড়িতে লাগিল। তিনি দিবারাত্র শ্রীর সমীপেই থাকিতে লাগিলেন। এদিকে রাজকার্য্যে অমনোযোগী হওয়ায় কর্ম্মচারীরা প্রজার প্রতি অত্যাচার করিতে লাগিল; রাজ কোষও শূন্য করিল।

এদিকে ছোট রাণী রাজসভায় পরীক্ষা দানের পর পীড়িত হইলেন, এ রোগ হইতে তাঁহার আর উদ্ধার হইল না। এদিকে রাজ্যের বিশৃঙ্খলা-নিবারণের জন্য চন্দ্রচূড় বহু কষ্টে রাজাকে একদিন দরবারে বসাইলেন। কিন্তু তাহার ফল বিপরীত হইল সুতরাং তিনি কাশী যাত্রা করিলেন। শ্রীর প্রণয়ে আকৃষ্ট হইয়া সীতারাম অধঃপতনে যাইতেছেন দেখিয়া জয়ন্তী শ্রীকে কৌশলে অন্তর্হিত করিল। শ্রীকে না দেখিয়া রাজা ক্ষিপ্তপ্রায় হইলেন। জয়ন্তীকে বিবস্ত্রা করিয়া বেত্রাঘাতের আদেশ করা হইল। কিন্তু মধ্যমা রাণী নন্দার চেষ্টায় সে বর্ব্বর দণ্ড কার্য্যে পরিণত হইল না।

পুনরায় মুসলমানেরা নগর আক্রমণ করিল। সে অভিযানে গঙ্গারাম তাহাদের সঙ্গে ছিল। সীতারাম যুদ্ধে অগ্রসর হইলেন এ সময়ও পুনরায় সেই সন্ন্যাসিনী শ্রী ও জয়ন্তী আসিয়া তাঁহার যথেষ্ট সাহায্য করিলেন। একজন গোলন্দাজ কামানে আগুন দিতেছিল, এমন সময় শ্রী আসিয়া কামানের মুখে বুক পাতিয়া দিলেন। গোলন্দাজ সহসা সরিয়া দাঁড়াইল। সীতারাম আসিয়া তাহার মস্তক ছেদন করিলেন। তখন জানা গেল, সেই গোলন্দাজ শ্রীর ভ্রাতা পাপিষ্ঠ গঙ্গারাম। শ্রী তাহার প্রিয় ভ্রাতা গঙ্গারামের প্রাণহন্ত্রী হইলেন। কোষ্ঠীর ফল এইরূপে সত্য হইল। এদিকে সীতারাম নিজ মহিষী নন্দা ও পুত্র কন্যাদির সহিত হতাবশিষ্ট সৈন্যের সহিত নিরাপদ স্থানে পলায়ন করিলেন। মুসলমানেরা মহম্মদপুর অধিকার করিল।

কৃষ্ণকান্তের উইল।

হরিদ্রা গ্রামে কৃষ্ণকান্ত রায় নামে এক খুব বড় জমিদার ছিলেন। তাঁহার দুই পুত্র,—প্রথম হরলাল, দ্বিতীয় বিনোদলাল। কৃষ্ণকান্তের কনিষ্ঠ রামকান্তের একমাত্র পুত্র—গোবিন্দলাল। রামকান্ত অল্প বয়সে ইহলোক হইতে অন্তর্হিত হন। কৃষ্ণকান্ত বড় চতুর ও ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। কালে নিজ পুত্রেরা পাছে গোবিন্দলালকে বঞ্চনা করে, এই ভাবিয়া তিনি একখানি উইল লিখিয়া কনিষ্ঠের অংশ গোবিন্দলালকে দিলেন। হরলাল ইহাতে চটিল ও গোবিন্দলালকে অংশে বঞ্চিত করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল। ইহাতে কৃষ্ণকান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, তুমি আমার ত্যাজ্য পুত্র। এই বলিয়া তিনি উইল বদল করিয়া হরলালের অংশে শূন্য দিলেন। ব্রহ্মানন্দ ঘোষ নামে এক প্রতিবাসী ঐ উইলের লেখক হইয়াছিলেন। হরলাল গোপনে তাঁহাকে উৎকোচ দিয়া নিজের নামে বাদ জালা লিখাইয়া লইলেন। এই জাল উইল-পত্রখানি আসলের সহিত বদল করিবার জন্য হরলাল ব্রহ্মানন্দের বিধবা ভ্রাতুষ্পুত্রী রোহিণীর শরণাপন্ন হইলেন। একদা তিনি অত্যাচার ও দস্যু-পাতের হাত হইতে তাহার ধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছিলেন; সুতরাং রোহিণী তাঁহার অবাধ্য হইবে না, এ ভরসা তাঁহার ছিল। রোহিণী বিধবা হইলেও সধবার বেশে থাকিত। হরলালও তাহাকে লুব্ধ করিবার জন্য বিধবা বিবাহ করিবার আশা দিয়াছিলেন। রোহিণী হরলালের প্রণয়িনী হইবার আশায় কৃষ্ণকান্তের শয়ন-কক্ষ হইতে একদিন রাত্রিকালে আসল উইল লইয়া জাল উইল রাখিয়া আসিল; কিন্তু হরলাল বিবাহের প্রস্তাবে আর সম্মত হয় না। রোহিণীও তাহাকে উইল দিল না। হরলাল মনঃক্ষোভে ফিরিয়া গেল।

রোহিণীর ভাগ্নহত প্রণয়বাসনা পাত্রান্তর অন্বেষণ করিতে লাগিল। কৃষ্ণকান্তের বারুণী নামে এক উদ্যান-বেষ্টিত সরোবর ছিল। গোবিন্দলাল তথায় নিত্যই বায়ুসেবন করিতে যাইতেন, রোহিণীও বারুণীতে জল আনিতে যাইত। ক্রমে রোহিণী গোবিন্দলালে আসক্ত হইল। একদিন বারুণীতীরে বসিয়া রোহিণী গোবিন্দের জন্য কাঁদিতেছিল। গোবিন্দলাল দূর হইতে তাহা দেখিয়া সদয় চিত্ত হইলেন ও তাহার দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া তাহাকে আশ্বস্ত করিলেন।

তখন রোহিণী স্থির করিল, এই দেবতুল্য গোবিন্দলালের জন্য যে কোন উপায়ে আসল উইল বদলাইয়া যথাস্থানে রাখিয়া আসিতে হইবে। কিন্তু এবার গোপনে উইল রাখিতে গিয়া সে ধরা পড়িল। কৃষ্ণকান্ত তাহাকে উইল চোর ভাবিয়া তাহার মাথা মুড়াইয়া ঘোল ঢালিয়া দেশ হইতে তাড়াইয়া দিবার

ব্যবস্থা করিতেছিলেন, এমন সময়ে গোবিন্দলাল উপস্থিত হইয়া রোহিণীর বক্তব্য শুনিতে চাহিলেন। বৃদ্ধ কৃষ্ণকান্ত লোক দিয়া রোহিণীকে অন্তঃপুরে গোবিন্দলালের পত্নী ভ্রমরের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। গোবিন্দলাল অন্তঃপুরে গিয়া রোহিণীকে উইল চুরীর কারণ জিজ্ঞাসিলে, রোহিণী অকপটে সকল কথা বলিল। শেষে ইঙ্গিতে আপন প্রণয়-বাসনাও ব্যক্ত করিতে ত্রুটি করিল না। কৃষ্ণকান্ত গোবিন্দলালের প্রমুখাৎ হরলালের কীর্ত্তি-কলাপ জ্ঞাত হইয়া রোহিণীকে অব্যাহতি দিলেন।

অতঃপর একদিন সন্ধ্যাকালে গোবিন্দলাল বারুণীতে গিয়া দেখিলেন, বারুণীর স্বচ্ছ জলতলে বিসর্জ্জিত স্বর্ণপ্রতিমার মত রোহিণী শয়ান রহিয়াছে। দর্শনমাত্র জলে পড়িয়া তিনি রমণীকে তীরে উঠাইলেন। তাঁহার শুশ্রূষায় রোহিণী বাঁচিল। রোহিণীর কথায় ঐ দিন হইতে গোবিন্দলালের মনের বিকার উপস্থিত হইল; রোহিণীর রূপে তাঁহার হৃদয় আকৃষ্ট হইল। ক্রমে গোবিন্দ-রোহিণীর প্রণয়-কাহিনী রাষ্ট্র হইল। উহা গোবিন্দের আদর্শ-পত্নী ভ্রমরের কাণে উঠিল। ভ্রমর কিন্তু স্বামীর উপর তিলমাত্র সন্দেহ করিল না।

ঐ সময়ে কৃষ্ণকান্ত গোবিন্দলালকে মহলে পাঠাইলেন। এদিকে কলঙ্কের কথা রটায় রোহিণী ভাবিল, এ নিশ্চয়ই ভ্রমরের কাজ। তখন সে ভ্রমরকে জ্বালাইবার জন্য কতকগুলি গিল্টির গহনা ও একখানি বেনারসী সাড়ী লইয়া গিয়া এরূপ ভাবে কথোপকথন আরম্ভ করিল যে, ভ্রমরের গোবিন্দলালের প্রতি অবিশ্বাসের সঞ্চার হইল। সে স্বামীকে এজন্য অনুযোগ করিয়া পত্র লিখিয়া পিত্রালয় চলিয়া গেল।

কৃষ্ণকান্ত গোবিন্দলালকে রোহিণীর প্রতি আসক্ত জানিয়া তাঁহার প্রাপ্য বিষয় ভ্রমরের নামে উইল করিয়া দিলেন। অল্পদিন পরে তাঁহার মৃত্যু হইল। গোবিন্দ ভাবিলেন, ভ্রমর বিনাদোষে আমায় অবিশ্বাস করিয়া আমার বিনা অনুমতিতে পিত্রালয়ে গিয়াছিল, বিশেষতঃ সম্পত্তিতে আমার অধিকার নাই। এ অবস্থায় ভ্রমরের জীবন ধারণ অকর্ত্তব্য। এই বলিয়া তিনি দেশত্যাগী হইবার জন্য ভ্রমরের কাছে বিদায় লইতে গেলেন। ইহাতে ভ্রমর বড় কাতর হইল। কিন্তু তাহার কাতরতায় গোবিন্দের মন নরম হইল না। তখন রোহিণীর রূপ গোবিন্দের হৃদয়ে জাগিতেছিল। তিনি ভ্রমরকে ত্যাগ করিয়া রোহিণীকে গ্রহণপূর্ব্বক প্রসাদ-পুর নামক স্থানে অজ্ঞাতবাস করিতে লাগিলে

এদিকে ভ্রমর স্বামি-বিরহে দিন দিন ক্ষীণ হইতে লাগিল। কন্যার পীড়ার সংবাদ পাইয়া পিতা মাধবীনাথ হরিদ্রা গ্রামে আসিলেন। জামাতার ব্যবহারের বিষয় অবগত হইয়া নিশাকর নামক এক বন্ধুর সহিত প্রসাদপুরে উপস্থিত হইলেন। নিশাকর গোবিন্দলালের বাটীর সন্ধান জানিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। ভৃত্যদের সহিত কথোপকথন কালে রোহিণীর গবাক্ষ দিয়া নিশাকর বাবুকে দেখিয়া তাঁহার রূপে মুগ্ধ হইল; গোবিন্দলালের রূপ রোহিণীর নিকট তখন তুচ্ছবোধ হইল। সে ভৃত্য দ্বারা

নিশাকরকে চিত্রানদীর ঘাটে অপেক্ষা করিতে বলিল। চক্রী নিশাকর রোহিণীকে গোবিন্দের নিকট অবিশ্বাসিনী প্রতিপন্ন করিবার জন্য অপর ভৃত্যকে অর্থে বশীভূত করিয়া এ বৃত্তান্ত তাহার প্রভুকে জানাইতে বলিলেন। সন্ধ্যাকালে রোহিণী চিত্রার ঘাটে নিশাকরের সহিত মিলিল। নিশাকরের সহিত কথোপকথন কালে অন্তরাল হইতে গোবিন্দলাল আসিয়া রোহিণীর গলা টিপিয়া ধরিলেন, নিশাকর পলাইল। গোবিন্দ ক্রোধে অধীর হইয়া রোহিণীকে গুলি করিলেন, তখন পুলিশ মহাহুলস্থুল উপস্থিত করিল। কিন্তু গোবিন্দ ফেরার হইলেন। মাধবীনাথ তখন বিষণ্ণ মনে স্বদেশে ফিরিলেন।

বিরহসন্তপ্তা ভ্রমরও এ সংবাদে দ্বিগুণ কষ্ট অনুভব করিলেন। গোবিন্দলাল বৈরাগীর বেশে শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিতেছিলেন। পুলিশ সন্ধান পাইয়া তাঁহাকে সেখান হইতে ধরিয়া যশোহরে আনিলেন। সেখানে তাঁহার বিচার হইল। গোবিন্দলাল তখন দেওয়ানজীর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়া পাঠাইলেন। মাধবীনাথ ভ্রমরের অনুরোধে মকদ্দমার তদ্বিরের জন্য যশোহর যাত্রা করিলেন। তাঁহার প্রদত্ত উৎকোচের বলে সকল সাক্ষীই ভাঙ্গিয়া গেল সহজেই জজ সাহেব আসামীকে বে-কসুর খালাস দিলেন। গোবিন্দলাল মুক্তি পাইয়া মাধবীনাথের ভয়ে কৌশলে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। মাধবীনাথ জামাতার সাক্ষাৎ না পাইয়া পুনরায় বিষণ্ণমনে দেশে ফিরিলেন।

গোবিন্দলাল কলিকাতায় আসিয়া কয়েক মাস কষ্টে যাপন করিলেন। পরিশেষে কিছুতেই আর না চলে না তখন পত্র দ্বারা ভ্রমরের নিকট অর্থ চাহিলেন। ভ্রমর গোবিন্দলালকে লিখিলেন, সমস্ত সম্পত্তি আপনার, আপনি আসিয়া ভোগ করুন। কিন্তু আমি থাকিলে আপনার মনে ক্লেশ হইতে পারে, তজ্জন্য আমি পিত্রালয়ে গিয়া থাকিব। ভ্রমরের পত্রের শেষ পঙ্‌ক্তি পড়িয়া গোবিন্দলালের মনে নির্বেদ উপস্থিত হইল। তিনি আর দেশে আসিলেন না।

ইহার পর ভ্রমর সাংঘাতিক পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া মুমূর্ষু হইলেন। তখন গোবিন্দলালকে শেষবার দেখিতে তাঁহার বড় বাসনা হইল। তিনি সে কথা স্বীয় ভগিনী যামিনীর নিকট প্রকাশ করিলেন। দৈবের নির্বন্ধে সেইদিন গোবিন্দলালও লুক্কায়িতভাবে হরিদ্রাগ্রামে আসিয়া ভ্রমরের কথা শুনিয়া সহসা তাঁহার শয্যার পার্শ্বে দাঁড়াইলেন। ভ্রমরের শেষ বাসনা পূর্ণ হইল। সে স্বামীর পদধূলি মাথায় লইয়া প্রাণ ত্যাগ করিল। উন্মত্ত গোবিন্দলাল কোথায় নিরুদ্দেশ হইলেন। ভাগিনেয় শচীকান্ত বিষয়ের উত্তরাধিকারী হইল।

চন্দ্রশেখরের গল্পাংশ।

গঙ্গাতীরবর্ত্তী একটি গ্রামে প্রতাপ নামক একটি দরিদ্র বালকের সহিত শৈবলিনী নাম্নী একটি সুন্দরী বালিকার বাল্যকালে প্রণয় জন্মে। শৈবলিনী প্রতাপের জ্ঞাতিকন্যা, সুতরাং তাহাদের বিবাহের সম্ভাবনা ছিল না। ইহা অবগত হইয়া তাহারা বহু মন্ত্রণার পর জলে ডুবিয়া মরিবার সঙ্কল্প করে। একদিন উভয়েই নদীজলে সন্তরণ করিতে করিতে মরিবার জন্য ডুব দেয়। কিন্তু শৈবলিনী প্রাণভয়ে তীরে উঠে; প্রতাপ ডুবিয়া যায়। চন্দ্রশেখর শর্ম্মা নামক এক শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ প্রতাপের উদ্ধার করিয়া তাহার বাটীতে রাখিতে যান। সেই সময় শৈবলিনী তাঁহার দৃষ্টিগোচর হয়। চন্দ্রশেখর রূপে মুগ্ধ হইয়া শৈবলিনীকে বিবাহ করিয়া গৃহে আনেন। শৈবলিনী যৌবনে পদার্পণ করিল। কিন্তু চন্দ্রশেখর একে বয়োধিক, তাহাতে আবার সর্ব্বদা শাস্ত্রালোচনায় কালহরণ করেন, সুতরাং শৈবলিনীর প্রেমলালসা সর্ব্বদা অতৃপ্ত থাকিত।

বাঙ্গলা-বিহার-উড়িষ্যার শাসন-কর্ত্তা নবাব মীরকাসেম খাঁ সে সময়ে মুঙ্গের দুর্গে বাস করিতেন। তাঁহার সহিত ইংরাজের যুদ্ধ-সম্ভাবনা ঘটিয়াছিল। দলনী বেগম নামে নবাবের এক প্রেয়সী ছিলেন। তিনি মীরকাসেমকে ইংরাজের সহিত যুদ্ধে নিরস্ত করিতে লাগিলেন, মীরকাসেম সম্মত হইলেন না। দলনী প্রশ্ন করিলেন, ইংরেজের সহিত যুদ্ধ কালে তিনি কোথায় থাকিবেন। মীরকাসেমের জ্যোতিষে বিশ্বাস ছিল, তিনি গণনা করিবার জন্য চন্দ্রশেখর শর্ম্মাকে আনিতে লোক পাঠাইলেন।

এতদুপলক্ষে চন্দ্রশেখরের অনুপস্থিতি কালে লরেন্স ফষ্টর নামক একজন ইংরাজের চেষ্টায় শৈবলিনী অপহৃতা হইয়া মুঙ্গের অভিমুখে নীতা হইল। এদিকে চন্দ্রশেখর গৃহে ফিরিয়া তাঁহার পত্নী অপহৃতা হইয়াছে শুনিয়া গৃহত্যাগী হইলেন। দলনী বেগম যুদ্ধের ভয়ে ভীত হইয়া একদিন রাত্রিতে পরিচারিকার সহিত নবাবের প্রধান সেনাপতি গুরগণ খাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিল। গুরগণ বিশ্বাসঘাতক। দলনী তাহার ভগিনী, ইহা কেহই জানিত না। গুরগণ খাঁ দলনীর কথায় বুঝিল, তাহার অপেক্ষা নবাবের প্রতি তাহার স্নেহ অধিক; সুতরাং সে ভগিনীকে অহিতাকাঙ্ক্ষিণী মনে করিয়া সে রাত্রিতে নবাবের দুর্গে প্রবেশ করিতে দিল না। দলনী পথে দাঁড়াইয়া রোদন করিতে লাগিল। এমন সময় একজন ব্রহ্মচারী কৃপা করিয়া দলনী ও তাহার পরিচারিকাকে লইয়া গিয়া একটি বাটীতে আশ্রয় দিলেন। এদিকে প্রতাপও শৈবলিনীর অপহরণের সংবাদ অবগত হইলেন।

প্রতাপ বিলক্ষণ বলশালী ও যুদ্ধকৌশলী ছিলেন। তাঁহার অবস্থাপন্ন

উন্মত্ত হইয়াছিল। তিনি শৈবলিনীর উদ্ধারের জন্য মুঙ্গেরে একটি বাড়ীতে ছিলেন। সেই বাটীতেই দলনী ও তাহার পরিচারিকাকে ব্রহ্মচারী স্থান দিয়াছিলেন। প্রতাপ ও তাঁহার পরিচারক রামচরণের যত্নে লরেন্স ফষ্টরের নৌকা হইতে শৈবলিনীও সেই রাত্রে প্রতাপের বাড়ীতে নীতা হইলেন। প্রতাপ শৈবলিনীর গৃহত্যাগে অত্যন্ত ক্রোধ প্রকাশ করিলেন। শৈবলিনী প্রতাপের জন্যই যে গৃহত্যাগিনী হইয়াছে, ইহা জানাইতে দ্বিধা করিল না। ইহাতে প্রতাপ মনে মনে রুষ্ট হইল।

ইতোমধ্যে লরেন্স ফষ্টর দলবল সহ আসিয়া প্রতাপকে ও রামচরণকে বন্দী করিল এবং শৈবলিনী ভ্রমে দলনী বেগম ও তাহার পরিচারিকাকে লইয়া গেল। এদিকে নবাবের আদেশে শৈবলিনীকে কেল্লায় যাইতে হইল। নবাব শৈবলিনীর মুখে শুনিলেন, ইংরাজের লোক বেগমকে লইয়া গিয়াছে। শুনিয়া তিনি সেনানায়ক তকি খাঁর প্রতি ইংরাজের নৌকা ধরিবার আদেশ করিলেন। তারপর নবাবের নিকট হইতে একজন লোক, একটি পরিচারিকা ও অস্ত্রাদি সহ একখানি নৌকা চাহিয়া লইয়া শৈবলিনী ইংরাজের নৌকা হইতে প্রতাপের উদ্ধারের জন্য যাত্রা করিল। ইংরাজেরা নৌকায় কলিকাতা অভিমুখে যাইতেছিলেন। পথে শৈবলিনী তাঁহাদের নৌকা দেখিতে পাইয়া অবতরণ করিল এবং পাগলিনী সাজিয়া ইংরাজের নৌকায় গিয়া কৌশলে প্রতাপকে উদ্ধার করিল। তাহার পর প্রতাপ ও শৈবলিনী উভয়েই নদীতে ঝাঁপ দিয়া সন্তরণ করিতে করিতে বহু দূরে গিয়া পড়িলেন। সন্তরণকালে শৈবলিনী ও প্রতাপে অনেক কথা হইল; কিন্তু প্রতাপ ধার্ম্মিক, তিনি শৈবলিনীর পাপ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। বলিলেন, "তুমি আর কখনও আমার সাক্ষাৎ করিও না।" তখন শৈবলিনী তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া তীরবর্ত্তী গিরিকাননে প্রবেশ করিল। সেই দিন গভীর রজনীতে ঝড় বৃষ্টির মধ্যে অলক্ষ্যে চন্দ্রশেখরই তাঁহাকে সেই দুর্গম পর্ব্বতে ঘোর বিপদ হইতে রক্ষা করিলেন। প্রতাপের তিরস্কারে ও চন্দ্রশেখরের এই ব্যবহারে শৈবলিনী নিজের অপরাধ বুঝিতে পারিল। তখন সে অনুতপ্তা হইয়া সেই পর্ব্বত-গুহায় কোন ব্রহ্মচারীর নিকট ব্রত গ্রহণ করিল এবং অনন্যমনে স্বামীর চিন্তায় নিরত হইল। কঠোর ব্রতাবসানে শৈবলিনী স্বামীর দর্শন পাইল। ব্রহ্মচারি-বেশে চন্দ্রশেখর তাহাকে দেখা দিলেন। শৈবলিনী চন্দ্রশেখরের সঙ্গে গমন করিল।

এদিকে নবাব মীরকাসেমের আদেশে মহম্মদ তকি খাঁ মুর্শিদাবাদে ইংরাজদের নৌকা আটক করিল। সে সংঘর্ষে আহত হইয়া লরেন্স ফষ্টর পলায়ন করিল। পলাইবার সময় বেগমকেই সকল অনর্থের মূল ভাবিয়া সে দলনীকে আপনার নৌকা হইতে নামাইয়া দিল। এক মহাপুরুষের সাহায্যে দলনী মুর্শিদাবাদে নীত হইলেন। মহম্মদ তকি খাঁ দলনীর চরিত্রের বিরুদ্ধে মিথ্যাকলঙ্কারোপ করিয়া নবাবকে পত্র লিখিল। শেষে দলনী বিষ খাইয়া মরিল। তারপর নবাবের সহিত ইংরাজদের যুদ্ধ আরম্ভ হইল। প্রত্যেক যুদ্ধেই

নবাব পরাজিত হইলেন। তারপর কুলসম নাম্নী দলনীর পরিচারিকার মুখে নবাব দলনীর নির্দ্দোষতার বিষয় জানিয়া অনুতাপ করিলেন। ঘটনাক্রমে নবেন্দ্র ফষ্টর ধরা পড়িল।

চন্দ্রশেখর শৈবলিনীকে লইয়া বেদ গ্রামে আসিলেন। চন্দ্রশেখরের গুরু রামানন্দ স্বামীর যোগপ্রভাবে জানা গেল যে, শৈবলিনী ফষ্টর কর্ত্তৃক দূষিতা হয় নাই। কয়েকদিন পরে নবাবের দরবার বসিলে, দলনীর হত্যার হেতু মহম্মদ তকি খাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ হইল। শৈবলিনী কুলসম প্রভৃতি সাক্ষিরূপে হাজির হইল। মহম্মদ তকি খাঁকে জীবিত অবস্থায় কুক্কুর দ্বারা ভক্ষিত করাইবার আদেশ হইল। নবেন্দ্র ফষ্টরেরও বিচার আরম্ভ হইল। উহা শেষ হইবার পূর্ব্বেই নবাবের তাম্বুর বাহিরে গোলাহল শুনা গেল। ইংরাজের গোলা আসিয়া তাম্বুর মধ্যে পড়িল। এই সময়ে যে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হইল, চন্দ্রশেখর প্রভৃতি বিস্মিত হইয়া দেখিলেন, প্রতাপই তাহার প্রধান নায়ক। সেই যুদ্ধে প্রতাপ শত্রুর গোলায় প্রাণত্যাগ করিলেন। তখন জানা গেল, প্রতাপ শৈবলিনীকে প্রগাঢ় ভাল বাসিতেন; কিন্তু সে প্রণয় অবৈধ বলিয়া চিরকাল আত্মসংযম করিয়া ছিলেন। শৈবলিনী লোভসংবরণে অসমর্থা হইয়া পাছে বিপথে পদার্পণ করে, এইজন্য তিনি ইচ্ছাপূর্ব্বক এই যুদ্ধোপলক্ষে আত্ম-প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন।

দুর্গেশনন্দিনী।

দুর্গেশনন্দিনী, একটী ঐতিহাসিক উপন্যাস। গড়মান্দারণ নামক গ্রামের কোনদুর্গে পূর্ব্বকালে বীরেন্দ্রসিংহ নামা এক জায়গীরদার আধিপত্য করিতেন। তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া হীনবংশীয়া এক কামিনীর পাণিগ্রহণ ও তাঁহার গর্ভে এক কন্যা উৎপাদন করায় নিজ পিতা কর্ত্তৃক অবমানিত হইয়া গৃহত্যাগ করেন এবং দিল্লীর মোগল সম্রাটদিগের রাজপুতসেনামধ্যে নিবিষ্ট থাকিয়া খ্যাতি-প্রতিপত্তি লাভ করেন। তিনি সগ্রামে যে কামিনীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, সে উক্ত স্থানস্থ শশিশেখর নামক এক ব্রাহ্মণের উপপত্নী-গর্ভজা। শশিশেখর ঐ উপপত্নীগ্রহণ জন্য লজ্জায় দেশত্যাগী হইয়া বারাণসীতে গমনপূর্ব্বক তত্রত্য এক দণ্ডীর নিকট বহুদিন শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং তথায়ও এক শূদ্রার গর্ভে কন্যা উৎপাদন করায় গুরুকর্ত্তৃক অবমানিত হইয়া কিয়ৎকাল নিরুদ্দেশ ছিলেন। পরে পরমহংস হইয়া 'অভিরামস্বামী' এই পরিবর্ত্তিত নামে দিল্লীতে প্রকাশিত হইলে তাঁহার শূদ্রগর্ভজা কন্যা বিমলা তথায় গিয়া তাঁহার সেবায় নিযুক্তা হইয়াছিল। ঐ স্থানে অভিরামস্বামীর কৌশলে ও রাজা মানসিংহের সহায়তায়

বীরেন্দ্রসিংহ বিপাকে পড়িয়া বিমলার পাণিগ্রহণ করেন, এবং পিতৃবিয়োগের সংবাদ পাইয়া তাঁহাদিগকে সমভিব্যাহারে গ্রহণপূর্ব্বক স্বদেশ প্রত্যাগত হয়েন। তথায় তাঁহার প্রথমপত্নীগর্ভজা মাতৃহীনা কন্যা তিলোত্তমা বিমলা কর্ত্তৃকই প্রতিপালিত হইয়া ক্রমে যৌবনদশায় পদনিক্ষেপ করিলেন। ঐ সময়ে মোগল ও পাঠানদিগের যুদ্ধারম্ভ হওয়ায় রাজা মানসিংহ সসৈন্যে ঐ প্রদেশে গমন করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার পুত্র জগৎসিংহ পাঠানপরাজয়কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি ঘটনাক্রমে এক রজনীতে গড়মান্দারণের সমীপস্থ প্রান্তরমধ্যগত দেবমন্দিরে ঐ বিমলা ও তিলোত্তমাকে দর্শন করেন এবং দর্শনক্ষণ হইতেই তিলোত্তমা ও রাজকুমারের পূর্ব্বরাগসঞ্চার হয়। রাজকুমার ঐ সমরকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও অতিরাগবশতঃ, বিমলার সহকারিতায় এক গুপ্তদ্বার দিয়া বীরেন্দ্রসিংহের দুর্গমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক, তিলোত্তমার সমীপস্থ হয়েন। ঐ সময়েই পাঠানরাজ কতলুখাঁর সেনাপতি ওসমান সুযোগ পাইয়া সসৈন্য দুর্গমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক বীরেন্দ্রসিংহ, বিমলা, জগৎসিংহ, তিলোত্তমা প্রভৃতি সকল পরিবারকে বন্দীভূত করেন। বন্দীভাবের পর কতলুখাঁর আজ্ঞায় বীরেন্দ্রের শিরশ্ছেদ হয়; আহত জগৎসিংহ, ওস্মান ও কতলুখাঁর দুহিতা আয়েষার যত্ন ও শুশ্রূষায় আরোগ্যলাভ করেন; বিমলা পতিহন্তা কতলুখাঁর প্রাণবধ করিয়া পলায়ন করেন; মোগলপাঠানের সন্ধি হয়; এবং তিলোত্তমার সহিত জগৎসিংহের বিবাহ হয়—দুর্গেশনন্দিনী উপাখ্যানের স্থূলতাৎপর্য্য এই। কিন্তু এই তাৎপর্য্যমাত্রশ্রবণে দুর্গেশনন্দিনী কিরূপ পদার্থ, তাহা পাঠকেরা কিছুই বুঝিতে পারিবেন না, অতএব আমরা অনুরোধ করি তাঁহারা ঐ গ্রন্থখানি একবার আদ্যোপান্ত পাঠ করুন।

অভিরামস্বামী, বীরেন্দ্রসিংহ, জগৎসিংহ, ওস্মান, তিলোত্তমা, আয়েষা ও বিমলা এই কয়জনই এই আখ্যায়িকার প্রধান পাত্র। অভিরামস্বামী বোধ হয়, ভূদেবমুখোপাধ্যায়ের অঙ্গুরীয়বিনিময়স্থ রামদাসস্বামীর অনুজ হইবেন। ইনি যৌবনদশায় যেরূপ থাকুন, প্রৌঢ়াবস্থায় বিলক্ষণ বিজ্ঞবিচক্ষণ হইয়াছিলেন। ইঁহারই পরামর্শে মোগল পাঠানের যুদ্ধসময়ে মোগলের পক্ষ অবলম্বনকরিতে বীরেন্দ্রসিংহের প্রবৃত্তি হয়। এই পরামর্শদানের পর ইঁহার আর বড়সাড়া শব্দ পাওয়া যায় নাই—বীরেন্দ্রের বধকালে একবারমাত্র দেখাদিয়াছিলেন। তৎপরে ইনি কতলুখাঁর বধের জন্য বিমলার নিকট ছুরিকা প্রেরণ করেন, এবং তিলোত্তমার পীড়ার সময়ে রাজপুত্রকে আনাইয়া তাঁহার মন আর্দ্র করেন এবং তিলোত্তমার সহিত তাঁহার বিবাহ দেন। বিমলাকে বীরেন্দ্রসিংহে অর্পিত করিবার সময়ে ইঁহার যেরূপ বুদ্ধিকৌশল প্রদর্শিত হইয়াছিল, অপর কোন স্থলে সেরূপ হয় নাই—অতএব আমাদের বিবেচনায় বুদ্ধিকৌশলে ইনি পূর্ব্বোল্লিখিত রামদাস স্বামীর তুল্য লোক নহেন।

বীরেন্দ্রসিংহ উদ্ধতস্বভাব মহাবীর। এ গ্রন্থে তাঁহার অধিক কার্য্য বর্ণিত নাই। কতলুখাঁর সভায় প্রাণদণ্ডাজ্ঞার সময়ে

তাঁহার সাহস, তেজস্বিতা, মৃত্যুভয়শূন্যতা, দৃপ্ততা প্রভৃতি যাহা যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা ক্ষত্রিয়বীরের একান্ত অনুরূপ।— গ্রন্থের নায়ক জগৎসিংহ নবীনবয়স্ক, বুদ্ধিমান, তেজস্বী, ধার্ম্মিক, সাহসিক ও প্রেমিক লোক। তিনি আখ্যায়িকামধ্যে আদ্যোপান্ত উপস্থিত থাকিয়া কত কার্য্য করিয়াছেন, তাহার সংখ্যা নাই, সুতরাং সে সমুদয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে উল্লেখকরা বাহুল্য। তবে একথা বলিতে পারি যে, জগৎসিংহের ক্ষত্রিয়োচিত কার্য্যকলাপ, মহাকুলসম্ভূতোচিত তেজস্বিতা প্রভৃতির কোথাও কিছুমাত্র ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়নাই। তিনি কারাগার মধ্যে উপস্থিতা তদ্গতজীবিতা তিলোত্তমাকেও যে অননুরাগসূচকবাক্যে ব্যথিত করিয়াছিলেন, তাহাও অনুচিত হয়নাই। কারণ তিনি তৎপূর্ব্বে শুনিয়াছিলেন, তিলোত্তমা কতলুখাঁর উপপত্নী হইয়াছেন। এ কথাশ্রবণের পর তিলোত্তার প্রতি তাঁহার পূর্ব্বভাব থাকা সম্ভব নহে।—আয়েষা পরমসুন্দরী, বুদ্ধিমতি, অসাধারণগুণশালিনী, যুবতী রাজকন্যা। তিনি বিপৎসময়ে রাজপুত্রের যেরূপ শুশ্রূষা করিয়াছিলেন, তাহা না করিলে হয়ত তাঁহার আরোগ্যলাভই দুর্ঘট হইত; কিন্তু সেই আয়েষাও মুক্তকণ্ঠে অনুরাগপ্রকাশ করিলেও রাজপুত্রের মনে তাঁহার প্রতি এক নিমেষের জন্যও অন্যভাব জন্মেনাই। ইহা নায়কের পক্ষে সাধারণ গুণ নহে। ফলতঃ তিনি না বুঝিয়া তিলোত্তমার প্রতি যেরূপ ব্যবহারই করুন না কেন, তাহার প্রতি তিলোত্তমার সেই প্রগাঢ় অনুরাগ কোনমতে অপাত্রে ন্যস্ত হয়নাই।

গ্রন্থকার কতলুখাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র ও সেনাপতি ওসমানকে কেবল মুখে 'পাঠানকুলতিলক' বলিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন, তাহা নহে—সত্য সত্যই তাঁহাকে পাঠানকুলতিলক করিয়াতুলিয়াছে। গড়মান্দারণের দুর্গে প্রবেশ করিয়া একাকিনী বিমলার সহিত তাঁহার কথোপকথন, বন্দীভূত আহত রাজপুত্রের প্রতি তাদৃশ সদয় ব্যবহার, আপনার মনোরথপ্রিয়া আয়েষা করতলগত শত্রুর প্রতি অনুরক্তা হইয়াছে বুঝিয়াও স্থিরভাবে তাহা সহ্যকরা, সামর্থ্য সত্ত্বেও প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রতি অন্যরূপ অনিষ্টাচরণ না করিয়া দ্বন্দ্বযুদ্ধে তাঁহাকে আহ্বান করা, পরাজয় হইলেও প্রাণরক্ষার্থ ক্ষমাপ্রার্থনা না করা প্রভৃতি ওসমানের কৃত কার্য্যগুলির যে কোনটীর দিকে অনুধাবন করিয়া দেখা যায়, তাহাতেই তাঁহার প্রতি প্রগাঢ় ভক্তির উদ্রেক হয়। পাঠানদিগের চরিত্র সচরাচর যেরূপ বর্ণিত হয়, তাহাতে ওসমানের ঐ 'সমগ্র' উদার কার্য্য না দেখিয়া 'কতক' দেখিলেও তাঁহাকে পাঠানকুলতিলক বলা যাইতে পারিত।

গ্র[illegible]য়িকা দুর্গেশনন্দিনী তিলোত্তমা সুন্দর[illegible] ধীরা, নবীনা, অনুরাগিণী নায়িকা। তিনি [illegible] শৈলেশ্বর শিবমন্দিরে জগৎসিংহ[illegible] দে[illegible]ই মুগ্ধ হয়েন, বাটীতে আ[illegible] নি[illegible]নে অন্যমনস্ক হইয়া চাহি[illegible] কালী দিয়া 'অ' 'ই' হিজিবিজি ও [illegible] জগৎসিংহ' ইত্যাদি লেখেন এবং আর আর কত কর্ম্ম [illegible] পরিশেষে কারাগারে জগৎসিংহের [illegible]স্থিত হয়েন। ঐ স্থানে তিলোত্তমা[illegible] বস্থা অতি মনোহররূপে বর্ণিত হইয়াছে। ঐ নবীনা রাজকন্যা সুযোগ পাইয়া দুর্গ হইতে বাহির

হইয়াছিলেন, যেখানে যাইবার কথা ছিল তাহা ভুলিয়াগিয়াছেন, কিছুই মনে নাই, কেবল 'জগৎসিংহ' এই নাম মুখ হইতে নির্গত হওয়ায় সহচর তাঁহাকে পুনর্ব্বার দুর্গমধ্যে আনিয়া কারাগারে জগৎসিংহের গৃহদ্বারে উপস্থাপিত করিল। গৃহপ্রবেশে তিলোত্তমার পা সরে না, কথঞ্চিৎ প্রবেশ করিলেন, প্রাচীর ধরিয়া অধোবদনে দাঁড়াইলেন, জগৎসিংহ চিনিয়া 'বীরেন্দ্র-সিংহকন্যা! এখানে কি অভিপ্রায়ে? এই নিরনুরাগ শুষ্ক সম্ভাষণ করিলেন। শুনিয়া তিলোত্তমার হৃদয়ে শেল বিদ্ধ হইল, মস্তক ঘুরিতে লাগিল ও মূর্চ্ছা হইল। আয়েষা আসিয়া তাঁহার মূর্চ্ছাপনয়ন করিলেন এবং তাঁহারই অনুমতিতে দাসীর স্কন্ধে ভর দিয়া তিলোত্তমা ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন।—এই প্রকরণের বিবরণটী যে কিরূপ, স্বভাবসঙ্গত ও কিরূপ মধুর হইয়াছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না—পাঠ মাত্র সমুদয় ব্যাপার যেন চিত্তপটে চিত্রিত হইয়া উঠে।

তিলোত্তমার বিষয়ে গ্রন্থকারের সহিত ৩টী স্থলে আমাদের কিঞ্চিৎ বিবাদ আছে। ১মতঃ তিলোত্তমা ও বিমলা সায়ংকালে শৈলেশ্বর পূজা করিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু সন্ধ্যাসময়ে শিবপূজা করিতে যাওয়া আমাদের দেশে রীতি নাই; আর তাহা থাকিলেও বাহকেরা যে, ঝড়বৃষ্টি জন্ম সেই প্রান্তরমধ্যে দুইটী স্ত্রীলোককে ফেলিয়া পলাইল, অর্দ্ধরাত্র পর্য্যন্ত প্রত্যাগত হইলনা! ইহা কিছু অসঙ্গত বোধ হয়। ২য়তঃ—শিবমন্দিরে জগৎসিংহ ও তিলোত্তমার দর্শনমাত্র পরস্পরের মনে অনুরাগসঞ্চার হয়। সংস্কৃতবাক্য বঙ্কিমবাবুর আখ্যায়িকার আদর্শ নহে—তাঁহার আদর্শ ইংরেজি আখ্যায়িকানুরাগীরা আমাদিগের পুণ্ডরীক মহাশ্বেতাদির ন্যায় রূপদর্শনমাত্র সঞ্চরিত অনুরাগে 'পাশির অনুরাগ' Animal love বলিয়া দোষ দিয়া থাকেন, সুতরাং বঙ্কিমবাবুর ন্যায় ইংরেজিবিৎ লোকের গ্রন্থে সে দোষ সঙ্ঘটন হওয়া উচিত হয়-নাই। ৩য়তঃ—এই পুস্তকের নায়কনায়িকা সাহেব বিবি নহেন—হিন্দু। হিন্দুদিগের সমানবর্ণ ব্যতিরেকে অসমানবর্ণে বিবাহ হওয়া তখন রীতি ছিলনা। সুতরাং জগৎসিংহ ও তিলোত্তমার পরস্পর সমানবর্ণত্ব জ্ঞান হইবার পূর্ব্বে অনুরাগসঞ্চার হওয়া এবং তিলোত্তমার প্রকৃত পরিচয় পাইবার আগেও তাঁহার জন্ত জগৎসিংহের সেই সেই রূপ মনোভাব প্রকাশ করা আমাদের বিবেচনায় সদ্যুক্তিসঙ্গত হয়-নাই। কালিদাস এরূপস্থলে কিপ্রকার সাবধান হইয়াছেন, পাঠকগণ তাহা শ্রবণ করুন।—

রাজা দুষ্মন্ত শকুন্তলার অলৌকিক রূপ-লাবণ্যা দিসন্দর্শনে মুগ্ধ হইলেন, তাঁহার প্রতি সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন, অমনি তাঁহার মনে বিতর্ক উঠিল, পাছে এ ব্রাহ্মণকন্যা হয়! ক্ষণেক পরে মনে মনেই সে তর্কের মীমাংসা হইল এবং স্থির করিলেন—

অসংশয়ং ক্ষত্রপরিগ্রহক্ষমা যদার্য্য মস্যা
মভিলাষি মে মনঃ।
সতাংহি সন্দেহপদেষু বস্তুষু প্রমাণ মন্তঃ-
করণ-প্রবৃত্তয়ঃ"

এইরূপ চিন্তার পর কিছুক্ষণ ধৈর্য্যা-বলম্বন করিয়া রহিলেন বটে; কিন্তু মনের সম্যক্ প্রীতি হইলনা। পরে যখন শকুন্ত-

দাকে ক্ষত্রিয়কন্যা বলিয়া জানিতে পারি-লেন, তখন আহ্লাদে গদগদ হইয়া কহি-লেন—

অসংশয়ং ক্ষত্রপরিগ্রহক্ষমা যদার্য্যমস্যামভিলাষি মে মনঃ।

সতাং হি সন্দেহপদেষু বস্তুষু প্রমাণমন্তঃকরণপ্রবৃত্তয়ঃ॥

আয়েষা যথার্থই দেবকন্যারূপিণী। ইঁহার রূপ, গুণ, বুদ্ধি, বিবেচনা, উদারতা, ধৈর্য্য সকলই অলৌকিক। ইনি জগৎ-সিংহের পীড়িতাবস্থায় অক্লান্তভাবে যেরূপ শুশ্রূষা করিয়াছিলেন—ওস্মান ইঁহার পাণিগ্রহণাভিলাষী হইয়া অভি-প্রায় প্রকাশ করিলে যেরূপ উত্তর দিয়াছিলেন—জগৎসিংহের প্রতি পত্নী-ভাবে গাঢ়ানুরক্তা হইয়াও যেরূপে মনো-ভাব গোপনে রাখিয়াছিলেন—কারাগারে ওস্মানের কথায় অসহিষ্ণু হইয়া যেরূপ দৃপ্তভাবে তাহা প্রকাশ করিয়াছিলেন—রাজপুত্র বিদায় লইবার সময়ে সাক্ষাৎ করণপ্রার্থী হইলে যে কারণে দর্শন দিতে অসম্মতা হইয়াছিলেন—তাঁহাকে যেরূপ পত্র লিখিয়া ছিলেন—এবং তিলোত্তমার সহিত তাঁহার বিবাহ সময়ে অলঙ্কারাদি-প্রদানপূর্ব্বক যেরূপ ভাব প্রকাশ করিয়া-ছিলেন—সে সমুদয় নিবিষ্টচিত্তে পর্য্যা-লোচনা করিলে মনোমধ্যে বিস্ময়, করুণা, ভক্তি ও আনন্দরসের প্রবাহ উচ্ছলিত হইয়া উঠে। অঙ্গুরীয় বিনিময়ের রোসি-নারাও ইঁহার ভগিনী বটেন, কিন্তু তাহা অপেক্ষা ইঁহার সৌন্দর্য্য, গাম্ভীর্য্য ও ধৈর্য্য অনেকগুণে অধিক।

এক্ষণে বিমলা।—বিমলা যে, অভি রামস্বামীর কন্যা ও বীরেন্দ্রের ধর্ম্মপত্নী, তাহা বীরেন্দ্রের মৃত্যুর পূর্ব্বে সকলে জানিত না—প্রধান পরিচারিকাই বোধ-করিত। বিমলা আখ্যায়িকার আদ্যো-পান্ত সর্ব্বত্রই ভ্রমমাণা। তিনিই প্রথমে দেবমন্দিরে জগৎসিংহের সহিত কথা কহেন; তিনি মনোহরবেশে সুসজ্জিত হইয়া আসমানীর দ্বারা বিদ্যাদিগ্গজের দুরবস্থা করিয়া তাঁহাকে সমভিব্যাহারে গ্রহণপূর্ব্বক রজনীতে সেই দেবমন্দিরে যাইয়া জগৎসিংহের সহিত পুনর্ব্বার সাক্ষাৎ করেন; তিনিই জগৎসিংহকে গুপ্তদ্বার দিয়া তিলোত্তমার নিকট উপস্থিত করিয়া দেন; তাঁহারই অসাবধানতায় পাঠান-দিগের কর্ত্তৃক দুর্গ অধিকৃত হয়; তাঁহারই পত্রে আখ্যায়িকাস্থ পাত্রগণের পরিচয়-বিষয়ক সমুদয় অন্ধকার দূরগত হয় এবং তিনিই সুরা ও নৃত্যগীত দ্বারা কতলুখাঁর মন মোহিত করিয়া আলিঙ্গনসময়ে ছুরিকাদ্বারা তাহার প্রাণবধ করিয়া পতিবধপ্রতিহিংসার সাধন করেন। বিম-লাকে তাদৃশ রূপবতী বলিয়া বোধ না হউক, কিন্তু তাঁহার ন্যায় রসিকা, প্রমোদ-মানা, বিবেকবতী ও প্রত্যুৎপন্নমতি কামিনী অতি দুর্লভ। গ্রন্থের সর্ব্বত্রই তিনি প্রচুর-পরিমাণে আপন গুণের পরিচয় দিয়াছেন; সে সমুদয়ের বিস্তৃতরূপে উল্লেখ করা বাহুল্য, সুতরাং আমরা পাঠকগণকে অন্ততঃ দুইটী স্থান অভিনিবেশপূর্ব্বক পাঠ-করিতে অনুরোধ করি—যখন পাঠান-সেনাপতি বিমলাকে ওড়না দ্বারা ছাদের আলিসার সহিত বাঁধিয়া রহিমখাঁর জিম্মায় দিয়া যান, তখন রহিমখাঁকে "সেখজী! তুমি বড় ঘামিতেছ, একবার আমার বন্ধন খুলিয়া দেও যদি, তবে

আমি তোমাকে বাতাস করি; পরে আবার বাঁধিয়া দিও” ইত্যাদি সরস কথায় ভুলাইয়া মুক্তিলাভ করা—সেই এক স্থান—এবং যখন কতলু খাঁর জন্মতিথির রজনীতে মনোহরবেশধারিণী বিমলা কৌশলে তাঁহার বক্ষে ছুরিকা নিঘাত করিয়া—“পিশাচী নই সয়তানী নই—বীরেন্দ্র-সিংহের বিধবা স্ত্রী” এই বলিয়া দ্রুতবেগে পলায়ন করেন—সেই এক স্থান। অধিক কি, বিমলার চরিত্র গ্রন্থকার আদ্যোপান্তই এরূপ মনোহরভাবে চিত্রিত করিয়াছেন যে, উঁহাকেই সময়ে সময়ে গ্রন্থের নায়িকা বলিতে আমাদের ইচ্ছা হয়। ফলতঃ জগৎসিংহের সহিত রজনীতে সাক্ষাৎ করিবার জন্য মন্দিরে যাইবার পূর্ব্বে প্রকৃত অভিসারিকার ন্যায় তাদৃশ বেশভূষা করা এবং আসমানীর দ্বারা বোকা বামন বিদ্যাদিগগজকে উচ্ছিষ্টান্ন প্রভৃতি খাওয়াইয়া তাহার তত দূর দুরবস্থা করা এই দুইটী ভিন্ন বিমলার সমুদয় কার্য্যগুলিই আমাদের পরমপ্রীতিপ্রদ হইয়াছে। রামগতি

কপালকুণ্ডলা।

কপালকুণ্ডলা (২য় সংস্করণ)—২৫০ বৎসর গত হইল গঙ্গাসাগর হইতে প্রত্যাগমনকারী নবকুমার নামক এক ব্রাহ্মণযুবক ঘটনাক্রমে একাকী হিজলীর সমুদ্রকূলে পরিত্যক্ত হইয়া এক কাপালিকের আশ্রয় গ্রহণকারেন। কাপালিক আপন যোগসিদ্ধির বাসনায় তাঁহাকে বলি দিবার উদ্যোগ করিলে—কাপালিকেরই প্রতিপালিতা কপালকুণ্ডলানাম্নী এক পরমরূপবতী রমণী তাঁহার প্রাণরক্ষা করেন। নবকুমার অনূঢ়া সেই প্রাণদাত্রীকে বিবাহ করিয়া সমভিব্যাহারে গ্রহণ পূর্ব্বক নিজবাসস্থান সপ্তগ্রামের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে মতিবিবি নামে এক দ্যুতী যবনীর সহিত সাক্ষাৎ হয়। মতি বিবি বাস্তবিক ব্রাহ্মণ কন্যা এবং নবকুমারেরই পূর্ব্বপরিণীতা পত্নী। শৈশবে উহার পিতা সপরিবারে মুসলমানধর্ম্মাবলম্বী ও জাতিভ্রষ্ট হইয়া আগরায় গিয়া বাস করিয়াছিলেন, তথায় রূপলাবণ্যসম্পন্না মতিবিবি বাদসাহপুত্র প্রভৃতি আগরার অনেক আমীর ওমরার সহিত দূষিতচরিতা হইয়া বিস্তর ধন ও গৌরব লাভ করে। এই সময়ে সে নিজের কোন দুরভিসন্ধি-সাধনার্থ উড়িষ্যা গিয়াছিল—তথা হইতে প্রত্যাগমন সময়ে পথিমধ্যে নবকুমারের সাক্ষাৎ ও পরিচয় পাইয়া তাঁহার প্রতি গাঢ়ানুরাগা হইয়া পড়ে; কিন্তু তৎকালে সে ভাব প্রকাশ না করিয়া গন্তব্য স্থানে গমন করিল। নবকুমারও সপ্তগ্রামে আসিয়া পত্নীসহবাসে কিছুকাল যাপন করিলেন। মতিবিবির ইচ্ছা ছিল, জাহাঙ্গীর বাদসাহ হইলে সে তাঁহার প্রধান মহিষী হইবে; সে অভিলাষ সিদ্ধ না হওয়ায় আপন পূর্ব্বস্বামীর সহবাসে কাল-

যাপন করিবার অভিলাষে সপ্তগ্রামে আসিল এবং রূপ গুণ ধন রত্ন প্রভৃতি দ্বারা নবকুমারের মন ভুলাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু যখন কোনরূপে কৃতকার্য্য হইল না, তখন কপালকুণ্ডলার অনিষ্ট-সাধনে কৃতসঙ্কল্প হইল। ঐ সময়ে দ্বিতীয় কাপালিকও সন্ধান করিয়া কপালকুণ্ডলার অমঙ্গলসাধনার্থ ঐ স্থানে আসিয়াছিল। মতিবিবি বা পদ্মাবতী তাহার সহিত মিলিল। পদ্মাবতীর মানস সফল হইল—তাহার কৌশলে কপালকুণ্ডলাকে দুশ্চরিত্রা বলিয়া নবকুমারের প্রতীতি জন্মিল। কাপালিক সুরাপায়নদ্বারা নবকুমারের বুদ্ধিভ্রংশ করিয়া তাঁহাদের উভয়কেই গঙ্গাতীরস্থ শ্মশানে লইয়া গেল; তথায় সহসা গঙ্গার তট ভগ্ন হওয়ায় কপালকুণ্ডলা জলমগ্ন হইয়া অদৃশ্য হইলেন—এই স্থূল উপাখ্যান অবলম্বনকরিয়া এই আখ্যায়িকা বিরচিত। ইহা যদিও দুর্গেশনন্দিনীর ন্যায় ইতিহাসমূলক নহে, তথাপি স্থানে স্থানে অনেক ঐতিহাসিক বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। রামগতি।

মৃণালিনী।

মৃণালিনীর। স্থূল বিবরণ এই যে, মগধরাজের পুত্র হেমচন্দ্র মৃণালিনীনাম্নী মথুরার এক বৌদ্ধকন্যার প্রতি আসক্ত হইয়া গোপনে তাঁহার পাণিগ্রহণ করিয়া বণিক্‌বেশে কিয়ৎকাল তথায় অবস্থান করেন, এই সময়ে বখতিয়ার খিলিজী মগধরাজ্য জয়করিয়া লয়েন। হেমচন্দ্রের গুরু মাধবাচার্য্য হেমচন্দ্রের দ্বারাই অপহৃত রাজ্যের পুনরুদ্ধারের বাসনা করিয়া তাঁহাকে মৃণালিনীর সহিত বিযুক্ত রাখিবার অভিলাষে কৌশলপূর্ব্বক মৃণালিনীকে গৌড়নগরস্থ আপন শিষ্যালয়ে পাঠাইয়া দেন এবং বঙ্গেশ্বরের সহিত মিলিত হইয়া যবনজয় করিবার উদ্দেশে হেমচন্দ্রকে বঙ্গদেশে প্রেরণ করেন। হেমচন্দ্র প্রথমে গৌড়নগরে আসিয়া এক ভিখারিণীর দ্বারা মৃণালিনীর সন্ধান করেন কিন্তু তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকার হইবার পূর্ব্বেই মাধবাচার্য্য তথায় উপস্থিত হইয়া হেমচন্দ্রকে নবদ্বীপে লইয়া আইসেন। মৃণালিনীও মাধবাচার্য্য-শিষ্যভবনে অপ্রকৃত কারণে অপমানিতা হইয়া উক্ত ভিখারিণীর সহিত নবদ্বীপে আসিয়াই অবস্থান করেন। ঐ সময়ে বখতিয়ার খিলিজী, নবদ্বীপাধিপতি লাক্ষ্মণ্যসেনের ধর্ম্মাধিকরণিক পশুপতির বিশ্বাসঘাতকতায় অক্লেশে নবদ্বীপ জয় করিলেন—হেমচন্দ্র প্রতিবন্ধকতা করিয়া কৃতকার্য্য হইলেন না, কিন্তু ঐ স্থানেই অনেক বিঘ্ন বিপত্তির পর মৃণালিনীর সহিত তাঁহার সমাগম হইল। অনন্তর তাঁহারা গৃহদাহদগ্ধ পতির অনুমরণসময়ে পশুপতি-পত্নী মনোরমা-কর্ত্তৃক প্রদত্ত বিপুল অর্থরাশি গ্রহণ করিয়া সমুদ্রকূলে

গমনপূর্ব্বক এক নূতনপুরী নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

বঙ্কিমবাবুর দুর্গেশনন্দিনীর সমালোচনায় আমরা কিঞ্চিৎ অধিক স্থান প্রদান করিয়াছি—উপস্থিত আখ্যায়িকাদ্বয়ে তত অধিক স্থান দিতে পারিব না। অতএব সংক্ষেপে বলিতেছি যে, কপালকুণ্ডলা ও মৃণালিনী দুইখানিই এতজ্জাতীয় পুস্তকের মধ্যে উৎকৃষ্ট পুস্তক হইয়াছে, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। বঙ্কিমবাবু ইঙ্গরেজিতে বিলক্ষণ কৃতবিদ্য লোক; তিনি ইউরোপীয় প্রধান প্রধান কবিদিগের রচিত অনেক আখ্যায়িকা পুস্তক অধ্যয়ন করিয়াছেন, সুতরাং কি প্রণালীতে বর্ণনীয় পাত্রগণের কার্য্যকলাপ নিবদ্ধ হইলে ইউরোপীয়-রুচি-সম্পন্ন পাঠকদিগের কৌতূহলোদ্দীপক হইবে, তাহা উত্তম জানেন এবং গ্রন্থের সর্ব্বস্থানেই আপনার জ্ঞানের প্রচুর উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি নবকুমার, কাপালিক, কপালকুণ্ডলা ও মতিবিবির এবং হেমচন্দ্র, মৃণালিনী, গিরিজায়া, মাধবাচার্য্য, পশুপতি, মনোরমা প্রভৃতির চরিতগুলি অধিক স্থলেই স্বভাবসঙ্গত ও মনোহররূপে চিত্রিত করিয়াছেন। পাঠের সময়ে প্রায় সকলগুলিই চিত্তক্ষেত্রে সজীবভাবে যেন বিচরণ করিতে থাকে; ইহা রচয়িতার সামান্য নৈপুণ্য নহে। এই দুই পুস্তকেই কতকগুলি গীত ও কবিতা নিবেশিত আছে, তাহার কএকটি অতি মনোরম হইয়াছে, বিস্তৃতি ভয়ে আমরা তাহার কিছু উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না।

কপালকুণ্ডলার মতিবিবি—লুৎফ উন্নিসা—বা পদ্মাবতীকে গ্রন্থকার মুখে যেরূপ রূপবতী বলিয়াছেন, তাঁহার বর্ণনা-পাঠ করিয়া আমরা উহার সে প্রকার রূপ দেখিতে পাইলাম না—আমাদের চক্ষুতে মতিবিবি বাটামুখী এক ধুমোধামা মাগী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যাহা হউক, তাহার বুদ্ধিকৌশল, অধ্যবসায়, নবকুমারের প্রতি সেই প্রখর অনুরাগ, তাঁহাকে পাইবার জন্য সেই সেই দুশ্চেষ্টা, তন্মধ্যেও মনের কিঞ্চিৎ উদারতা প্রভৃতি যাহা যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা তদ্বিধা কামিনীর পক্ষে সর্ব্বতোভাবেই সঙ্গত হইতে পারে।—অদৃষ্টদোষে সংসারসুখে বঞ্চিতা এক হতভাগিনীর চরিত বর্ণন করিবার অভিলাষেই, বোধহয়, কবি কপালকুণ্ডলার সৃষ্টি করিয়া থাকিবেন। যদি সে অভিপ্রায় থাকে, তাহা সিদ্ধ হইয়াছে, বলিতে হইবে। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় গ্রন্থের নায়ক বা নায়িকার গুণ সকল এরূপ হওয়া উচিত, যাহা অন্যের স্পৃহণীয় হইতে পারে। কপালকুণ্ডলার রূপ ও অন্যান্য অনেক রমণীয় গুণ ছিল সত্য, কিন্তু তাঁহার তাদৃশী উদাসীন-প্রকৃতিকতা কি কোন সংসারীর বাঞ্ছনীয় হইতে পারে? কপালকুণ্ডলার ন্যায় কামিনীকে কোন পাঠক আপন গৃহিণী করিতে চাহেন কি?—আমরা ত কখনই না! স্ত্রীর যদি অলৌকিক রূপ থাকে—অন্যান্য বিষয়ে অসাধারণ গুণ থাকে, আর তোমার প্রতি তাহার কিছুমাত্র অনুরাগ না থাকে—সংসারের সকল কার্য্যেই তাহার ঔদাসীন্য হয়, তবে সে স্ত্রীকে লইয়া তোমার কি প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে?—কপালকুণ্ডলার সাংসারিক কোন বিষয়ে আস্থা ছিলনা।—স্ত্রীজাতির সর্ব্বাপেক্ষা রমণীয় গুণ যে পতিপরায়ণতা,

তাহা তাঁহার কিছুমাত্র ছিলনা—সুতরাং যে স্ত্রীর অপগমে নবকুমারের কোন ক্ষতি হইয়াছে, তাহা আমাদের বোধ হয় না। —আর এক কথা এই, কপালকুণ্ডলা অশুভান্ত আখ্যায়িকা; ইহার উপসংহারে নায়িকার মৃত্যু হইয়াছে, সুতরাং তদর্থ পাঠকদিগের শোক উপস্থিত হইবে। যাহাকে শোচনীয় করিতে হইবে, তাহার পূর্ব্বাবস্থা ভাল ছিল, অগ্রে সেরূপ বর্ণনা করিয়া রাখা আবশ্যক। সুখোচিত ব্যক্তির দুঃখদর্শনে মন যেরূপ আর্দ্র হয়, সামান্যাবস্থ লোকের দুরবস্থায় কখন সেরূপ হয় না। রাম যুধিষ্ঠিরাদি রাজপুত্রও সুখাভ্যস্ত ছিলেন, এই জন্য, তাঁহারা বনগমন করিয়া ফলমূলাদি দ্বারা জীবনধারণ করিতে লাগিলেন, শুনিয়া আমরা কাঁদিয়া অস্থির হই, কিন্তু সাঁওতাল, ভিল প্রভৃতি কত অসভ্য জাতীয়েরা যে যাবজ্জীবন বনে বনে ফিরিতেছে ও ফলমূলাদিদ্বারা উদরপূরণ করিতেছে, তাহাদের কথা শুনিয়া কিছুমাত্র ক্লেশ বোধ করি না। এ আখ্যায়িকার নায়িকা কপালকুণ্ডলার পূর্ব্বাবস্থা কিরূপ ছিল, গ্রন্থকার তাহা কোন স্থলে বর্ণন করেন নাই; এমন কি তিনি কাহার কন্যা? কোন্ দেশে বাস করিতেন? কিরূপে খৃষ্টানদিগের হস্তগত হইয়াছিলেন? ইত্যাদি পরিচয়ও কোথাও দেওয়া হয় নাই, সুতরাং তাঁহার অমঙ্গলে পাঠকদিগের উচিতমত সমদুঃখতার আবির্ভাব হওয়া সম্ভব নহে।

মৃণালিনীর চরিত্র সেরূপ হয় নাই। তিনি ধনী লোকের কন্যা ও আদরের ধন ছিলেন, এ জন্য তাঁহার সহিত পাঠকদিগের যথাবৎ সমদুঃখতা রহিয়া গিয়াছে। হৃষীকেশ ব্রাহ্মণের বাটী হইতে তাঁহার বিবাসন এবং নবদ্বীপস্থ সরোবরকূলে হেমচন্দ্র কর্তৃক তাঁহার অবমাননা, এ দুই স্থল পাঠ করিবার সময়ে বোধ হয় অনেককেই সাশ্রুনেত্র হইতে হয়। এই উপাখ্যানস্থ ভিখারিণী গিরিজায়া যেন একটী আহ্লাদে পুতুল; বাচালতা কিঞ্চিৎ কম হইলে গিরিজায়া আরও মনোহারিণী হইত। মনোরমাকে গ্রন্থকার একটী অদ্ভুত পদার্থ করিয়া তুলিয়াছেন। উঁহার বিবরণ পাঠ করিতে মনে একপ্রকার আমোদ হয় সন্দেহ নাই, কিন্তু এক শরীরেই বহুরূপার ন্যায় একক্ষণে 'সরল বালিকা ভাবের' ও পরক্ষণেই 'গম্ভীরপ্রকৃতি প্রৌঢ়যুবতীভাবের' প্রাপ্তি হওয়া কতদূর স্বভাবসঙ্গত, তাহা আমরা বলিতে পারিনা। এই কয়টী আখ্যায়িকা পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্নের লিখিত, তাঁহারই রচনা এস্থলে উদ্ধৃত ও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

বিষ-বৃক্ষ।

নগেন্দ্র দত্ত নামে গোবিন্দপুর গ্রামের এক ধনশালী জমিদার কলিকাতায় যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে মধুপুর গ্রামে একটি গৃহে তিনি ঝড় বৃষ্টির সময় আশ্রয় লন। ঐ গৃহে এক বৃদ্ধ মুমূর্ষু অবস্থায় পড়িয়া ছিল—তাহার পার্শ্বে এক ত্রয়োদশ-বর্ষীয়া সুন্দরী বালিকা, তাহার নাম কুন্দনন্দিনী। অল্পক্ষণ পরে বৃদ্ধের মৃত্যু হওয়ায় নগেন্দ্রের সাহায্যে তাহার সংকার হইল। কুন্দের আর কেহ ছিল না। গ্রামবাসীরা বলিল, কলিকাতায় ইহার মাসীর বাড়ী, ইহাকে লইয়া গেলে বড় উপকার করা হয়। অগত্যা নগেন্দ্র সম্মত হইলেন। কলিকাতায় আসিয়া তিনি কুন্দের মাসীর বাড়ীর অনেক অনুসন্ধান করিলেন; কিন্তু পাইলেন না। কাজেই কুন্দ তাঁহার গলায় পড়িল। তিনি কুন্দকে লইয়া স্বগ্রামে উপনীত হইলেন।

পত্নী সূর্য্যমুখীর অনুরোধে নগেন্দ্র তারাচরণ নামক এক জ্ঞাতি সম্পর্কীয় ব্যক্তির সহিত কুন্দের বিবাহ দিলেন। তারাচরণ একটু লেখা পড়া শিখিয়াছিল। সে দেবীপুর গ্রাম নিবাসী সুরাসক্ত জমিদার দেবেন্দ্র দত্তের ব্রাহ্মসমাজ-ভুক্ত হইয়াছিল। মধ্যে মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধে ও স্ত্রীস্বাধীনতা সম্বন্ধে অনেক বক্তৃতাও করিত। কাজেই বিবাহের পর অনিচ্ছা সত্ত্বেও দেবেন্দ্রের সহিত পত্নীকে পরিচিত করাইয়া দিতে হইল। দেবেন্দ্র কুন্দের সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ হইলেন। বিবাহের তিন বর্ষ পরে কুন্দ বিধবা হইল। সূর্য্যমুখী তাহাকে আপনার গৃহে রাখিল। দেবেন্দ্র তখন একদিন বৈষ্ণবীবেশে নগেন্দ্রের বাড়ী গিয়া কুন্দকে দেখিয়া আসিলেন। তিনি তাহাকে কৌশলে গৃহত্যাগিনী করাইবারও চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু পারেন নাই।

এদিকে কুন্দের প্রতি নগেন্দ্রেরও নজর পড়িল। তিনি প্রথমে আত্মসংবরণের চেষ্টা করেন; কিন্তু তাহাতে অসমর্থ হইয়া বিধবার বিধিক্রমে বিবাহ করিতেই কৃতসঙ্কল্প হন। নগেন্দ্রের ভাবান্তর দেখিয়া পতিগতপ্রাণা সূর্য্যমুখী বিপন্ন হইয়া কমলমণি নাম্নী ননদকে এ বিপদ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য ডাকিলেন। কমল স্বামীর আদেশ লইয়া কলিকাতা হইতে গোবিন্দপুরের ভবনে উপস্থিত হইলেন। কমলমণি আসিয়া কুন্দকে গোবিন্দপুর ত্যাগপূর্ব্বক ঘরে লইয়া যাইতে স্বীকৃতা হইলেন। কুন্দ নগেন্দ্র ও সূর্য্যমুখীর মঙ্গলের জন্য বহু কষ্টে তাহাতে সম্মত হইল, এই সময়ে একদিন দেবেন্দ্র হরিদাসী বৈষ্ণবীবেশে নগেন্দ্র দত্তের অন্তঃপুরে দেখা দিলেন; কিন্তু এবার সূর্য্যমুখী তাহাকে পুরুষ বলিয়া সন্দেহ করিয়া হীরা নাম্নী দাসীকে তাহার অনুসরণ ও পরিচয় আবিষ্কার করিতে বলিলেন। সেইদিন সন্ধ্যাকালে নগেন্দ্র উদ্যানস্থিত সরোবর-কূলে কুন্দকে দেখিতে

পাইয়া আপনার প্রণয়-লালসা জ্ঞাপন করিলেন। বিধবা-বিবাহ রীতিক্রমে তাহাকে বিবাহ করিতে চাহিলেন, কিন্তু কুন্দ সম্মত হইল না।

হীরা বৈষ্ণবীর অনুসরণ করিয়া সকল সংবাদ জানিল। সূর্য্যমুখী সব শুনিলেন। তিনি পূর্ব্বে বৈষ্ণববেশী দেবেন্দ্রের সহিত কুন্দকে চুপি চুপি কথা কহিতে শুনিয়াছিলেন। কাজেই তিনি তাহাকে দুশ্চরিত্রা ভাবিয়া তিরস্কার পূর্ব্বক গৃহত্যাগ করিতে বলিলেন। সেই তিরস্কারে কাতরা হইয়া অনাথিনী গভীর নিশীথে সূর্য্যমুখীর গৃহত্যাগ করিল। পথে ঝড়বৃষ্টিতে আক্রান্ত হইয়া এক গৃহে আশ্রয় লইল। সে গৃহ হীরার। হীরা কুন্দকে কয়েকদিন নিজের ঘরে লুকাইয়া রাখিল।

হীরা দেবেন্দ্রের প্রতি অজ্ঞাতসারে আসক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এ কারণে কুন্দের প্রতি দেবেন্দ্রের প্রীতি দর্শনে তাহার মনে বিদ্বেষের সঞ্চার হইল। এ দিকে কমল, নগেন্দ্র ও সূর্য্যমুখী সকলেই কুন্দকে খুঁজিয়া দিবার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করিলেন। কুন্দকে গালাগালি দিয়াও পরে তাহার নির্দ্দোষতা বুঝিয়া সূর্য্যমুখী বড় অনুতপ্ত হইয়াছিলেন। হীরা কিন্তু কুন্দকে বাহির করিয়া দিয়া পুরস্কার গ্রহণে ইচ্ছা করিল না। কারণ, সে বড় হিংসুক। সূর্য্যমুখীর সুখ, স্বামীসোহাগ সে দেখিতে পারে না। তাই সে তাহাকে বিপন্ন করিবার জন্য নগেন্দ্রকে জানাইল যে, সূর্য্যমুখীই কুন্দকে তাড়াইয়া দিয়াছেন। নগেন্দ্র প্রকৃত জানিবার জন্য পত্নীকে সে কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। সূর্য্যমুখী অকপটে তাহা স্বীকার করিলেন। নগেন্দ্রও অকপটে বলিলেন, কুন্দকে না পাইলে তিনি দেশত্যাগী হইবেন। তখন কুন্দকে খুঁজিবার জন্য সূর্য্যমুখী এক মাস সময় চাহিয়া লইল।

এ দিকে কুন্দ হীরার গৃহে থাকিয়া নগেন্দ্রের অদর্শনে নিতান্ত অধীর হইয়া উঠিল এবং চুপি চুপি একদিন শেষ রাত্রিতে দত্তদিগের উদ্যানে আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রাতে সে সূর্য্যমুখীর দৃষ্টিপথবর্ত্তিনী হইলে সূর্য্যমুখী তাহাকে আদর করিয়া ঘরে লইয়া গেলেন। এবং নিজে উদ্যোগী হইয়া স্বামীর সহিত তাহার বিবাহ দিলেন। নগেন্দ্রের সুখ দেখিয়া তিনি আনন্দিত হইলেন; কিন্তু পরে স্বীয় ভাবী অবস্থার কথা ভাবিয়া তীব্র যন্ত্রণায় অধীর হইয়া গৃহত্যাগিনী হইলেন। নগেন্দ্র পরদিন হইতে সূর্য্যমুখীর বহু অনুসন্ধান করাইলেন। কিন্তু তাহা বিফল হইল।

সূর্য্যমুখীর পলায়নে আপনাকে অপরাধিনী ভাবিয়া লজ্জায় কুন্দ বড় অসুখী হইল। মুখ ফুটিয়া বালিকা—কথা আসে না বলিয়া নগেন্দ্র তাহাকে পাইয়া সুখী হইলেন না। তাঁহার সূর্য্যমুখী মনে পড়িতে লাগিল। বুঝিয়া কুন্দ আরও অসুখী হইল। নগেন্দ্র অস্থির হইলেন, বিষয়কর্ম্মের ভার দেওয়ানজির উপর দিয়া সূর্য্যমুখীর অনুসন্ধানার্থ বাহির হইলেন।

হীরা আবার নগেন্দ্রের গৃহে দাসীপদ গ্রহণ করিল। দেবেন্দ্র [illegible] বৈষ্ণবী বেশে দত্তগৃহে গিয়া কুন্দের দর্শন না পায়, তাহার উপায় করিবার জন্যই সে তথায় আবার চাকরী লইয়াছিল।

ইহার পর মুণ্ডিত দেবেন্দ্র কুন্দের দর্শন-লাভ-বাসনায় একদিন রাত্রিকালে নগেন্দ্রের উদ্যানে প্রবেশ করিয়াছিল। কিন্তু হীরা দ্বারবানদিগকে সংবাদ দেওয়ায় তিনি প্রাণভয়ে সেস্থান ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন।

সূর্য্যমুখী মধুপুরের পথে কাঙ্গালিনী-বেশে ঘুরিয়া ঘুরিয়া এক বৃক্ষতলে পীড়িতা অবস্থায় পড়িয়া ছিলেন। এক সন্ন্যাসী তাঁহাকে আশ্রয় দিয়া তাঁহার প্রাণরক্ষা করিলেন। অতঃপর সূর্য্যমুখীর অনুরোধে নগেন্দ্রকে মুমূর্ষু পত্নীকে দয়া করিয়া দেখিতে আসিবার জন্য পত্র লিখিলেন। নগেন্দ্র তখন বারাণসীতে ছিলেন, কাশী হইতে তথায় পত্র গেল। পড়িয়াই তিনি সূর্য্যমুখীর জন্য মধুপুর ছুটিলেন। সে স্থানে গিয়া শুনিলেন, যে গৃহে সূর্য্যমুখী থাকিত, সে গৃহ পুড়িয়া গিয়াছে, তাহাতে সূর্য্যমুখীও মরিয়াছে। এ সংবাদে তিনি হতচেতন হইলেন। জ্ঞানলাভ হইলে "সব ফুরাইয়াছে" ভাবিয়া গৃহধর্ম্মের নিকট চির বিদায় লইবার জন্য—কমলমণির পুত্রকে সব বিষয় সম্পত্তি দান করিবার জন্য গোবিন্দপুরে ফিরিলেন।

এদিকে দেবেন্দ্র হীরাকে শাস্তি দিতে কৃতসংকল্প হইলেন। হীরাকে একদিন স্বীয় প্রমোদোদ্যানে ডাকাইয়া তাহার নিকট স্বীয় অকৃত্রিম প্রণয় প্রকাশ করিলেন।—হীরা তাহাতে ভুলিল মজিল—কপর্দ্দকের বিনিময়ে অমূল্য সতীত্বরত্ন বিসর্জ্জন করিল। তখন দেবেন্দ্র বলিলেন, "এখন কুন্দের সহিত আমার সাক্ষাৎ না করাইলে তোমার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ এই পর্য্যন্ত।" তখন হীরা ক্রোধে অন্ধ হইয়া তাঁহাকে কটূক্তি করিল। দেবেন্দ্র পদাঘাতে তাহাকে বিতাড়িত করিলেন। হীরা প্রতিশোধ-গ্রহণবাসনায় স্থির সংকল্প করিল। কুন্দনন্দিনীর জন্যই সে দেবেন্দ্র কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে ভাবিয়া তাহাকে বিষদানের সুযোগ খুঁজিতে লাগিল।

নগেন্দ্র উইলপত্র রেজেষ্টারি করিবার জন্য গৃহে ফিরিলেন। কিন্তু কুন্দের সহিত সাক্ষাৎ বা বাক্যালাপ করিলেন না। কুন্দ ইহাতে মর্ম্মাহত হইয়া আত্মহত্যার সঙ্কল্প করিল। হীরা তাহাকে সে বিষয়ে সহায়তা করিল।

নগেন্দ্র সেই রাত্রিতে সূর্য্যমুখীর শয়নগৃহে শয়ন করিয়া তাঁহার গুণ চিন্তা করিতেছিলেন। এমন সময় সহসা একটি ছায়ামূর্ত্তি গৃহপ্রবিষ্টা হইতে দেখিলেন, পরে বুঝিলেন, সে সূর্য্যমুখী। এইরূপে উভয়ের মিলন হইল। সূর্য্যমুখী তখন আত্মবৃত্তান্ত বলিলেন। তাঁহার মৃত্যুসংবাদ যে ভ্রম—ভ্রান্তি, তাহা নগেন্দ্রের বিদিত হইল। সূর্য্যমুখীর আবির্ভাবে গৃহে আনন্দ-কোলাহল হইতে লাগিল। ইতোমধ্যে কুন্দ বিষ ভক্ষণ করিয়া প্রাণত্যাগ করিল। তদবধি হীরা অদৃশ্য হইল। সে পাগলিনী হইয়া এক বৎসর পরে দেবেন্দ্রের সহিত মিলিল, দেবেন্দ্র তখন মৃত্যুশয্যায়। অতিরিক্ত মদ্যপানে রোগাক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইল। মৃত্যুকালে তাহাকে তিরস্কার করিয়া হীরা অন্তর্দ্ধান করিল।

রাজসিংহ।

রূপনগর রাজস্থানের একটি সামান্য পার্ব্বত্য রাজ্য। তথাকার রাজা বিক্রম সোলঙ্কির কন্যা চঞ্চলকুমারী যেমন রূপ-গুণসম্পন্না তেমনই তেজস্বিনী। তিনি একবার বাদসাহ ঔরঙ্গজেবের একখানি চিত্র চরণে দলিত করিয়া বলেন, জীবিত ঔরঙ্গজেবকে পাইলে তিনি তাঁহার মুখে ঐরূপ পদাঘাত করিবেন।

ঘটনাক্রমে এই কথা ঔরঙ্গজেবের কর্ণগোচর হইল। তিনি চঞ্চলকুমারীর দর্পচূর্ণ করিবার জন্য কৃতপ্রতিজ্ঞ হইলেন। তিনি তাঁহার প্রিয়তমা উদিপুরী বেগমের নিকট প্রতিশ্রুত হন যে, রাজকুমারী চঞ্চল রংমহালে আসিয়া বেগম সাহেবাকে তামাকু সাজিয়া খাওয়াইবেন। এই বলিয়া তিনি রূপনগরের রাজার নিকট দুই সহস্র সৈন্য সমেত এক পরওয়ানা পাঠাইয়া জানাইলেন যে, চঞ্চলকুমারীর রূপগুণের খ্যাতি শুনিয়া তিনি তাঁহাকে বেগম করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। অতএব রাজা যেন মোগল সৈন্যের সহিত তাঁহার কন্যাকে দিল্লী পাঠাইয়া দেন।

যে বাহিনী রূপনগরে চলিল, মবারক নামে এক পরম সুন্দর মোগল যুবক তাহার অন্যতম অধিনায়ক। মবারকের বিবাহিতা স্ত্রী দরিয়া বিবি স্বামীর অত্যন্ত অনুগতা ও ছায়ার ন্যায় অনুগামিনী। কিন্তু মবারক অন্যে চিত্তসমর্পণ করিয়াছিল। জেব উন্নিসা নামে ঔরঙ্গজেবের প্রিয়তমা ও মহা প্রতাপশালিনী দুহিতা অত্যন্ত দুশ্চরিত্রা ছিলেন। তাঁহার অন্যান্য অনুগ্রহের পাত্রের মধ্যে মবারকও একজন। জেবউন্নিসা যে মবারককে সত্যই ভাল বাসিতেন, দর্প ও গরিমার স্ফীত হইয়া তাহা তিনি নিজেই বুঝিতে পারিতেন না। তাই রূপনগরে যাত্রার পূর্ব্বদিনে যখন মবারক অনুনয় করিয়া জেবউন্নিসাকে তাঁহার সহিত পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হইতে বলিলেন, তখন তিনি উত্তর করিলেন যে, তাহাদের বর্ত্তমান সম্বন্ধ দৃঢ়তর করিবার কোন প্রয়োজন নাই; কেননা শাহজাদীদের পাপপুণ্য কিছুই নাই, বাদশাহের কন্যারা ভাল বাসিতে জানে না। মর্ম্মাহত মবারক বিষণ্ণচিত্তে রূপনগর যাত্রা করিল।

পরওয়ানা পাইয়া বিক্রম সিংহ উৎফুল্ল হইলেন, কন্যাকে মোগল সেনার সমভিব্যাহারে দিল্লী পাঠাইয়া দিলেন, চঞ্চলকুমারী কিন্তু সখী নির্ম্মলার সহিত পরামর্শ করিয়া ইতোমধ্যে উদয়পুরের রাণা রাজসিংহকে এ ঘটনা জানাইয়া তাঁহার শরণ লইলেন। রাজসিংহ অত্যল্পমাত্র সেনা সঙ্গে লইয়া প্রধানতঃ মাণিকলাল নামক এক অনুগত ও সুচতুর অনুচরের কৌশলে দিল্লীর পথে বাদশাহের সৈন্যদিগের হস্ত হইতে চঞ্চলকুমারীর উদ্ধার-সাধন করিলেন। বাদসাহের সহিত বিবাদে রাণার অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া চঞ্চলকুমারী স্বয়ং মবারকের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে দিল্লি লইয়া যাই

অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু তখন সকল অবস্থা বুঝিয়া বাঁদর মবারক তাহাতে অসম্মত হইলেন।

চঞ্চলকুমারী রাজসিংহের যশ ও বীরত্বে মুগ্ধ হইয়া পূর্ব্বেই তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। রাণাও বীর্য্যবতী বালার সৌন্দর্য্যে ও গুণে আকৃষ্ট হইয়া বিবাহাভিপ্রায়ে বিক্রমসিংহকে অনুমতি-প্রার্থনা-সূচক পত্র লিখিলেন। বিক্রম সিংহ তাঁহাকে উত্তরে জানাইলেন যে, বাদশাহের সহিত বিবাদ করিয়া রাণাকে জামাতৃপদে বরণ করেন এমন সাধ্য তাঁহার নাই। তবে যদি রাণা কখনও বাদশাহের সমান হইয়া শরণাগতকে রক্ষা করিতে পারেন, তবেই তিনি এ বিবাহে সম্মতি দিবেন। একজন জ্যোতির্ব্বিদ্‌ও গণিয়া বলিয়াছিল যে, যদি কখনও সসাগরা ধরণীশ্বরের অঙ্কলক্ষ্মী রাজকুমারীর পরিচর্য্যা করেন, তাহা হইলেই তাঁহার সহিত রাণার বিবাহের সম্ভাবনা। কাজেই রাণাও দিল্লীশ্বরের সহিত বিবাদের প্রয়োজন হইল। চঞ্চলকুমারী উদীপুরী বেগমকে তাঁহার তামাকু সাজিয়া খাওয়াইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। আগুন জ্বলিয়া উঠিল।

এদিকে মবারক দিল্লীতে ফিরিয়া আসিয়া আর জেবউন্নিসার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন না। দরিয়া মবারকের অজ্ঞাতসারে রাজস্থানে তাঁহার অনুবর্ত্তিনী হইয়া মৃত্যুমুখ হইতে মবারককে বাঁচাইয়াছিল। তাহার কার্য্যে প্রীত ও চমৎকৃত হইয়া মবারক মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, দরিয়াকে লইয়াই তিনি সংসারধর্ম্ম করিবেন। জেবউন্নিসা যখন লোক পাঠাইলেও যখন তিনি আসিলেন না, তখন শাহজাদীর হিংসা জ্বলিয়া উঠিল। প্রতিহিংসা-সাধনের জন্য সুবিধা সত্ত্বেও মবারক চঞ্চলকুমারীকে লইয়া আসেন নাই, তাহা তিনি বাদশাহকে জানাইলেন। ফলে মবারক বাদশাহের হুকুমে সর্পদংশনে প্রাণ হারাইবার আদেশ পাইলেন।

ঔরঙ্গজেব রাজসিংহের দুঃসাহস ও চঞ্চলকুমারীর ঔদ্ধত্যের শাস্তি দিবার জন্য বহু সৈন্য লইয়া রাজস্থান যাত্রা করিলেন। সঙ্গে হস্তিপৃষ্ঠে ও দোলায় বেগমরাও চলিলেন। স্বয়ং বাদশাহ যাইতেছেন, সুতরাং লোকজন অনুচরবর্গের সংখ্যা নাই। এক মোগল বণিক পথপ্রদর্শক হইয়া দুই পার্শ্বে পর্ব্বতযুক্ত এক সঙ্কীর্ণ পথে লইয়া চলিল। বাদশাহ ও তাঁহার সৈন্যেরা অধিকাংশ সঙ্কীর্ণ পথে প্রবেশ করিবামাত্র রাজপুত-নিক্ষিপ্ত একটা প্রকাণ্ড পাথর গড়াইতে গড়াইতে আসিয়া পথের মুখ বন্ধ করিল। বাহিরের মোগলদিগকে অরক্ষিত অবস্থায় পাইয়া পশ্চাদ্ভাগ-স্থিত রসদ রাজপুতেরা লুণ্ঠন করিয়া লইল ও বেগমেরা বন্দিনী হইলেন। ইতোমধ্যে সন্ধ্যা আসিয়া উপস্থিত হওয়ায় ঔরঙ্গজেবকে পথিমধ্যে শিবির সংস্থাপন করিতে হইল। প্রভাতে দেখা গেল, গিরিপথের অন্তর্মুখও রাত্রিমধ্যে দৃঢ়ভাবে রুদ্ধ হইয়াছে। যে সকল মোগল পথ পরিষ্কার করিতে অগ্রসর হইল, তাহারা রাজপুতদিগের প্রস্তর ও গুলি-বর্ষণে বিপর্য্যস্ত হইয়া ফিরিয়া আসিল। পানাহার অভাবে ক্লিষ্ট সসৈন্য ঔরঙ্গজেব পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গের ন্যায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

যে মোগল বণিক ঔরঙ্গজেবকে পথ দেখাইয়া ফাঁদে ফেলিল, সে মবারক ভিন্ন আর কেহই নহে। মবারক সর্পাঘাতে মৃত বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছিলেন। রাজসিংহের অনুচর মাণিকলাল কিন্তু তাঁহাকে পুনর্জীবিত করিয়া উদয়পুরে লইয়া আসেন, প্রাণদানের পুরস্কারস্বরূপ কৃতজ্ঞ মবারক রাজপুতের নিকট বাদশাহকে ধরাইয়া দিলেন।

মবারক মাণিকলালকে জেবউন্নিসা সম্বন্ধে সকল কথা জানাইয়া শুধু বাদশাহজাদীর মনের ভাব কিরূপ, জানিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। মাণিকলাল চঞ্চলকুমারীর সখী নির্মলার কুমারীর স্বামী সুতরাং বন্দী বেগমদিগের মধ্য হইতে পরীক্ষার জন্য জেবউন্নিসাকে রাজপ্রাসাদে আনয়ন করা বিশেষ দুঃসাধ্য হইল না।

মবারকের মৃত্যুর পরে জেবউন্নিসা নিজের মনের ভাব বুঝিতে পারিল। তখন তাহার রুদ্ধ ভালবাসা উছলিয়া উঠিয়া তাহাকে অনুতাপে ও অনুশোচনায় বিদ্ধ করিতে লাগিল। যখন জেবউন্নিসা উদয়পুরে নীত হইল, তখন তাহার মনের অবস্থা ভয়ানক। মবারক যখন শুনিলেন, তাঁহার জন্য শাহজাদী প্রাণ বিসর্জনে উদ্যত, তখন তিনি তাঁহাকে দেখা দিলেন। জেবউন্নিসা পায়ে ধরিয়া মবারকের নিকট ক্ষমা ও দয়া ভিক্ষা করিল। অতঃপর উভয়ের যথাশাস্ত্র বিবাহ হইয়াছিল।

এদিকে ঔরঙ্গজেব মূষিকের ন্যায় জালে পড়িয়া রাণার সহিত সন্ধিস্থাপনে বাধ্য হইলেন। বিক্রমসিংহের বাসনা পূর্ণ হইল। জেবউন্নিসার সহিত উদীপুরী বেগমও রাণার প্রাসাদে নীত হইয়াছিলেন। চঞ্চল তাঁহাকে দিয়া তামাকু সাজাইয়া লইলেন। গণকের বাক্য সফল হইল। চঞ্চলকুমারী উদয়পুরেশ্বরী হইলেন।

ঔরঙ্গজেব দিল্লিতে উপস্থিত হইয়া সন্ধিভঙ্গ করিয়া রাজসিংহের জন্য পুনরায় সৈন্য পাঠাইলেন। মবারকও সঙ্গে আসিলেন। মোগল হইয়া বাদশাহের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করায় মবারকের জীবনে ধিক্কার জন্মিয়াছিল তাই তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিবেন স্থির করিয়াছিলেন। তাঁহার যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যু হই বটে, কিন্তু সে তাঁহার স্ত্রী দরিয়ার গুলিতে। রাজদণ্ডে মবারকের মৃত্যু সংবাদে দরিয়া উন্মাদগ্রস্ত হইয়া গিয়াছিল। সে একবার জেবউন্নিসাকে কাটিতে গিয়াছিল। মবারকের মৃত্যুর পর তাহাকে আর কেহ দেখিতে পায় নাই।

জেবউন্নিসা বসনভূষণ ত্যাগ করিয়া অবশিষ্ট জীবন মবারকের শোকে কাটাইল।

বলা বাহুল্য ঔরঙ্গজেবের রাজসিংহকে পরাজিত করিবার চেষ্টা ভবিষ্যতে [illegible] সফল হয় নাই।

সমাপ্ত